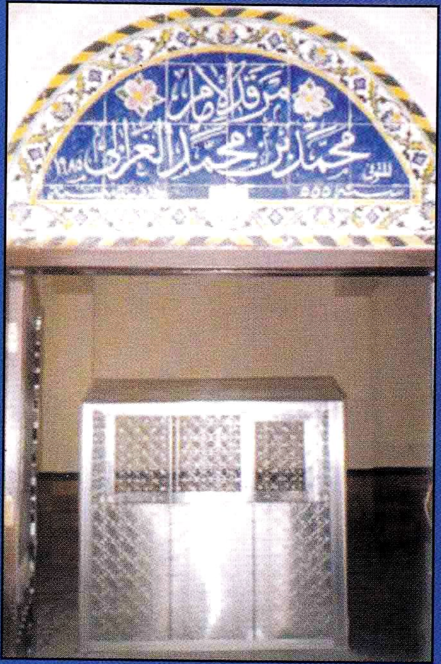
مشكوة الانوار

মিশকাতুল আনওয়ার

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)

বঙ্গানুবাদ : সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী



সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ Reformer (মুজাদ্দীদ) Theologist (ধর্মতত্ত্ববিদ) Jurist (আইনতত্ত্ববিদ) Philosopher (দার্শনিক) Cosmologist (সৃষ্টির রহস্যবিদ) Psychologist (মনোবিজ্ঞানী) Mystic, Great Sufi হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর মাজার শরীফের ভিতরের দৃশ্য। (বাগদাদ শরীফ, ইরাক)

রশীদ বুক হাউস
৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8604-09-X

مشكوة الانوار

মিশকাতুল আনওয়ার

মূল

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (র)

বঙ্গানুবাদ

সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী

হাকীকাতে মিলাদে মোস্তফা, সিরাতুল মুসতাকীম

মারেফতের গোপন ভেদসহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা

প্রকাশনায়

রশিদ বুক হাউস

৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

অনুবাদকের কথা

Hamd be Allah Talla Peace & Blessings be on Rasulullah. The Prophet Muhammad (P.B.U.H) Benedictions be over His pure Ahle-bait & overall His just and devoted companions (R).

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী (র) তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় বাহাত্তরটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠা যদি তাঁর গোটা জীবনের দিনগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে হিসেব করা হয়, তাহলে প্রতিদিন গড়ে ষোল পৃষ্ঠা লিখিত হয়েছে।

مِشْكٰوةُ الْاَنْوَارِ "মিশকাতুল আন্‌ওয়ার" গ্রন্থটি পবিত্র আল-কুরআনুল কারীমের একটি আয়াতের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা। আর আয়াতটি হচ্ছে–

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

(সূরা নূর, আয়াত নং ৩৫)

এতে ইমাম গায্‌যালী (র) আলোর প্রকারভেদ থেকে শুরু করে এর শুরু ও শেষ সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। এই অভিনব তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশ একমাত্র ইলহামের মাধ্যমেই সম্ভব। এ গ্রন্থটি হচ্ছে 'নূর' সম্পর্কে ঐশীলব্ধ নবতম জ্ঞানের নির্যাস।

আমার মতো একজন নাচিজ-এর দ্বারা হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী (র)-এর ন্যায় মহান হাস্তির জ্ঞানগর্ভ এই পুস্তকের অনুবাদের জন্য শুকরিয়া জানাচ্ছি– মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে।

পাঠকগণ অত্রপুস্তক পাঠে উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। সেই সাথে মূদ্রণ জনিত কোনপ্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেয়া হবে– ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহাত্মা হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম

ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র ও জগৎ বিখ্যাত এই দার্শনিক, প্রকৃত আলেম ও সংসারবিরাগী মহাপুরুষের নাম আবু হামেদ মোহাম্মদ। আর উপাধি হুজ্জাতুল ইসলাম বা ইসলামের প্রমাণ। তাঁর বংশগত উপাধি গায্যালী। খোরাসান প্রদেশের ভিতর তুস নামক একটি জেলার তাহরান শহরে ৪৫০ হিজরী সনে মোতাবেক ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা প্রসিদ্ধ লোক না হলেও তাঁর দাদা ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের ব্যক্তি। শৈশবকালেই তিনি পিতৃহারা হয়ে স্নেহময়ী জননীর ও শ্রদ্ধেয় দাদার তত্ত্বাবধানে বড় হন। আল্লামা সাহানী বলেন, গাজালাহ তুস জেলার ভিতর একটি গ্রামের নাম। সেখানেই ইমাম সাহেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছে গায্যালী।

জন্মস্থান, এর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা —

আল্লামা সামানী প্রমুখ কতিপয় ঐতিহাসিক– তুস নগরের উপকণ্ঠে 'গায্যালী' নামক পল্লীকে ইমাম সাহেবের জন্মভূমি বলেছেন। কিন্তু অন্যান্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মতে তুস নগরের উপকণ্ঠে 'গায্যালা নামে কোন পল্লী ছিল না; বরং তুস জিলার অন্তর্গত طَاهِرَانِ 'তাহেরান' নামক স্থানে ইমাম সাহেবের জন্ম হয়। ফলকথা, পারস্য দেশের তুস জেলার অন্তর্গত তাহেরান নামক শহরে, হিজরী ৪৫০ সন, মোতাবেক ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইমাম গায্যালী ধূলির ধরায় জন্মগ্রহণ করেন। সেই যুগে মুসলমান সমাজে শিক্ষা-দীক্ষার বহুল প্রচার ছিল। কারণ, মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের বাণী প্রচারের সাথে এও ঘোষণা করেছেন যে, "বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয।"

সে সময়ের মুসলমান ব্যক্তিবর্গ ইসলামের মূলবাণী কলেমায়ে তাওহীদকে যেমন শিরোধার্য করে নিয়েছেন, ঠিক সেরূপ গুরুত্ব সহকারে বিদ্যার্জনের প্রতিও তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ইমাম গায্‌যালীর সময়ে পারস্য দেশ সল্‌জুক বংশীয়দের প্রতিভাশালী সুলতান রুকনুদ্দিন তোগরল বেগের শাসনাধীন ছিল। সাল্‌জুক বংশীয় সুলতানগণ সম্বন্ধে মিস্টার লিয়েনপুল লিখেছেন, "সাল্‌জুকী সুলতানগণের রাজত্বকাল মুসলমানদের প্রভূত উন্নতির সময় ছিল। এদের পূর্বে ইরান ছিল ভূইয়া বংশীয় রাজাদের করায়াত্তে। তাঁরা ছিলেন শীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের আমলে মুসলিম শক্তিগুলো একে অন্যের উপর আক্রমণ করে দুর্বল হয়ে পরেছিল। কিন্তু সাল্‌জুক বংশীয় তুর্কীরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁদের প্রাক্ ইসলামিক হিংস্র স্বভাব অনুপম সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়। ফলে তাঁরা মুসলিম জাহানের হারিয়ে যাওয়া শক্তি এবং প্রতিভাকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হন। সমগ্র এশিয়াসহ এক বিরাট অংশ এই বাদশাহ্‌র কবলে (শাসনে) আসল। এই শক্তির উত্থানের ফলে খ্রীস্টিয় শক্তির অগ্রগতি রহিত হয়ে পরে।"

মুসলিম শক্তির অভ্যুত্থানের যুগে মুসলমানের হৃদয়ে বিদ্যাশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা এত তিব্র হয়েছিল যে, তাঁরা সে সময়ে প্রচলিত– ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও পারসিকদের জ্ঞান আহরণ সমাপ্ত করে প্রাচীন গ্রীক, রোমান, মিশরীয় এবং ভারতীয় জ্ঞান আহরণের প্রবৃত্ত হন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে আস্তিকবাদ, নাস্তিকবাদ, জড়বাদ, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান, বিশ্বাস ও মতবাদের সমাবেশ হয়ে মুসলমান সমাজে বহু মতানৈক্যের সূত্রপাত হয়। ইমাম গায্‌যালীর পূর্ববর্তীকালে মুসলিম জগতে ইসলামী আক্বীদা ও জ্ঞানের সঙ্গে নানাবিধ মারাত্মক অমুসলমানী আক্বীদা ও জ্ঞান কালক্রমে এমনভাবে মিশে গেছে যে, মুসলমানী এবং অমুসলমানী আক্বীদার মধ্যে পার্থক্য করা মুসলমানদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে মুসলমানদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকের ক্ষেত্রে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজে এত অধিক পরিমাণে পার্থিব

জ্ঞানের প্রসার হয়েছিল যে, সে সমস্তের চাপে ধর্মীয় বিদ্যার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। সুতরাং এই অবস্থা হতে ধর্মীয় বিদ্যাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই হযরত ইমাম গায্যালী (র) "মিশকাতুল আনোয়ার"-সহ আরো বিভিন্ন জগৎ বিখ্যাত পুস্তকাদি রচনা করেন।

শৈশব কাল ও শিক্ষা ব্যবস্থা

ইমাম সাহেবের পিতা একজন সূফী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি শেষ শয্যায় তাঁর একজন বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ডেকে আনলেন এবং সামান্য অর্থ তাঁর হাতে প্রদান করে নিজের শিশুপুত্র দু'টিকে (মোহাম্মদ ও আহমদ)-এর প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার তাঁর উপর অর্পণ করলেন। সে মুহূর্তে তিনি তাঁর বন্ধুকে সম্বোধন করে অশ্রু গদগদ কণ্ঠে বলেছিলেন, অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে আপনার নিকট আমার অনুরোধ, আপনি অনুগ্রহপূর্বক এই শিশু দুটোকে বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করবেন। এরা জ্ঞান লাভ করতে পারলে আমি আশা করতে পারি যে, তাদের জ্ঞান লাভের ওসিলায় আমার এই অনুতাপ সামান্য হলেও হ্রাস পেতে পারে।"

বাস্তব জীবনে দেখা যায় যে, তিনি এমন শুভমুহূর্তেই আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই প্রর্থনা জানিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্রকেই আল্লাহ তায়ালা বিশাল জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন। যার কারণে বড় ছেলে মোহাম্মদ পরে ইমাম মোহাম্মদ গায্যালী এবং কনিষ্ঠ আহমদ, ইমাম আহমদ গায্যালী নামে খ্যাতি লাভ করেন। এই যুগশ্রেষ্ঠ আলেম পুত্র দু'জনের পবিত্র জ্ঞানের ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের মরহুম পিতার বেসালের পর অভিভাবক যথাসময়ে তাদের দুজনকে স্থানীয় মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে শিক্ষার জন্য ভর্তি করিয়ে দিলেন। তারা দু'জনেই শৈশব হতে অসাধারণ প্রতিভা ও মেধাশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। অল্পকালের মধ্যে তাঁরা পূর্ণ কুরআন হেফজ করে কুরআনের হাফেজ হিসেবে জ্ঞান লাভ করেন এবং তৎপর আরবী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম প্রতিবন্ধকতা

ইমাম সাহেবের দরিদ্র পিতার বেসালের পূর্বমুহূর্তে তাঁর দু'পুত্রের শিক্ষা ও প্রতিপালনের জন্য বন্ধুর হাতে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে গিয়েছিলেন

ইতোমধ্যে তা নিশেষ হয়ে যায়। অভিভাবকের আর্থিক অবস্থাও দিন দিন অসচ্ছলতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল। সুতরাং একদিন তিনি তাঁদের দু'জনকে পাশে বসিয়ে স্নেহ কোমল কণ্ঠে বললেন, "বাবারা! তোমাদের পিতা তোমাদের জন্য আমার হাতে যে সামান্য অর্থ প্রদান করেছিলেন, বর্তমানে তা নিশেষ হয়ে গেল। আমার আর্থিক অবস্থাও ক্রমশঃ শোচনীয় হতে চলল, আমার তত্ত্বাবধানে নিজ গৃহে রেখে তোমাদেরকে ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করা এখন আমার সাধ্যের বাইরে। এমতাবস্থায় আমার কাছে থাকলে সংকটের সম্মুখীন হব। তোমাদের বিদ্যা শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা হবে না। অতএব, তোমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা এখন এটাই মনে করছি যে, তোমরা অন্যত্র কোথাও কোন সরকারী অবৈতনিক শিক্ষালয়ে ভর্তি হয়ে শিক্ষার চেষ্টা কর।" তাঁর উপদেশ মত তারা দু'ভাই শহরের এক অবৈতনিক মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

সে সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা

ইমাম সাহেবের সময়ে যদিও প্রধান প্রধান শহরে যথারীতি সরকারী অবৈতনিক মাদ্‌রাসার ব্যবস্থা ছিল এরপরও সমস্ত মসজিদে এবং বড় বড় ধর্মপ্রাণ লোকদের বসত বাড়ীতেও বহু বে-সরকারী মাদ্‌রাসার ব্যবস্থাও চালু ছিল। বড় বড় জ্ঞানী ও বিদ্বানগণ সংসার থেকে অবসর গ্রহণ করে এ সমস্ত মাদ্‌রাসায় বিনা বেতনে শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত হতেন। প্রবীণ শিক্ষাবিদগণ খোদাপ্রাপ্তির লক্ষে সংসার-ধর্ম ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে নির্জন বাস অবলম্বন না করে কিংবা কর্ম-ক্ষমতা অভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক সমাজের ঘাড়ে বোঝা-স্বরূপ না হয়ে শিক্ষাদান কার্যে প্রবৃত্ত হতেন। বিদ্যালয়ের পার্শ্বস্থ ধনী প্রতিবেশি ও আমীর-ওমরাহ্‌গণ উক্ত বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক এবং দূর দেশীয় শিক্ষার্থীদের ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। এ উপায়ে তৎকালে শিক্ষার পথ নিতান্ত সুগম ছিল। যে সমস্ত মসজিদে প্রধান প্রধান প্রবীণ ও উচ্চশিক্ষিত সুধীজন শিক্ষাদান করতেন, সে সমস্ত মসজিদ বা বিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হত। সুতরাং উচ্চ শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিনা ব্যয়ে জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার পথও নিতান্ত সহজ ছিল।

প্রতিবন্ধকতা হতে উত্তোরণ

যা হোক, ইমাম সাহেব পল্লীর ক্ষুদ্র মক্তব ত্যাগপূর্বক সাধারণের সাহায্যে নিকটবর্তী শহরের প্রধান অবৈতনিক মাদ্‌রাসায় আরবী ভাষা অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন। যেমন ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও অতুলনীয় মেধাশক্তি, তেমনি ভাগ্যক্রমে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জ্ঞান-পিপাসা মিটাবার জন্য মহামনীষী আবু হামেদ আসফারায়েনী, আবু মোহাম্মদ যোবেনী প্রমুখের ন্যায় মহাজ্ঞানী শিক্ষকের সন্ধান মিলিয়ে দিলেন। তিনি প্রাণ ভরে তৃপ্তি সহকারে জ্ঞান-সুধা পান করতে লাগলেন। খ্যাতনামা ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ মহাত্মা আহমদ ইবনে মোহাম্মদ রাযকানীর নিকট তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রের প্রাথমিক কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন।

ইমাম সাহেবের মাতৃভাষা ছিল ফার্সী। তিনি কুরআন মাজীদের হিফয খতম করার পর মাতৃভাষা শিক্ষায় বৃথা সময় অপচয় না করে সরাসরি আরবী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করলেন। সে সময়ে সর্বজ্ঞানাধার আরবী ভাষার গ্রন্থসমূহ বাল্যকাল থেকে মাতৃভাষার মাধ্যমে অধ্যয়ন করার ব্যবস্থা ছিল। তাতে পাঠ্য বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভের সাথে সাথে মাতৃভাষায়ও প্রভূত উন্নতি সাধন হত।

মোটকথা, ইমাম সাহেব উক্ত শিক্ষার সুযোগ অন্বেষণে নিজ জন্মভূমি তাহেরান শহর হিজরত করে 'জুরজান' শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে তিনি মহাত্মা ইমাম আবু-নসর ইসমাঈলের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাগ্রহণ আরম্ভ করেন। বালকের তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মহাত্মা ইসমাঈল সাহেব তাঁর পুত্রবৎ স্নেহে শিক্ষাদান করতে লাগলেন। অগাধ জ্ঞানের ভাণ্ডার, প্রবীণ শিক্ষক উপযুক্ত শাগরেদ পেয়ে সর্বশক্তি নিয়োগে তাঁকে প্রকৃত শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে শিক্ষাপদ্ধতি এরূপ ছিল যে, শিক্ষার্থীদেরকে শুধু কিতাব বুঝিয়ে দিয়েই শিক্ষকগণ ক্ষান্ত হতেন না; বরং শিক্ষা প্রদানকালে যে ভাষায় পাঠের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করতেন, শিক্ষার্থীদেরকে তা হুবহু লিখে নিতে বাধ্য করতেন। এ পদ্ধতিতে লিখিত নোটগুলোতে تَعْلِيْقَاتْ 'তা'লীকাত' বলা হত। এ নোটগুলো সম্পূর্ণই শিক্ষক সাহেবকে শুনিয়ে প্রয়োজনবোধে সংশোধন করে নেয়া হত। অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে ইমাম সাহেব নিজ শিক্ষকের দেয়া যাবতীয় পাঠের নোটগুলো সযত্নে রক্ষা করে বিরাট এক দফতর সঞ্চয় করেছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা

জুরজান শহরের পাঠ সমাপনান্তে একদিন তিনি তাঁর পরিশ্রম লব্ধ নোটের বোঝা কাঁধে নিয়ে কাফেলাসহ জন্মভূমি তাহেরানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে যাত্রীদল দস্যুদলের কবলে পতিত হন। দস্যুদল ইমাম সাহেবের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নেয়। তাঁর যাবতীয় দ্রব্যের সাথে 'তারিকাত'-এর দফতরটিও দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠন করে নেয়। তিনি নিজের অন্য কোন বস্তুর জন্য দুখিত না হয়ে কেবল নোটের দফতরটি হস্তচ্যুত হওয়ায় বিশেষ কাতর হয়ে পরলেন। কিন্তু ধৈর্যহারা হলেন না।

প্রতিবন্ধকতা হতে উত্তোরণ

অনন্তর ইমাম সাহেব দস্যু সরদারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "সরদারজী! আমি একজন দরিদ্র শিক্ষার্থী। আপনার দল আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়েছে। অন্য কোন বস্তুর জন্য আমি দুঃখিত নই। এর মধ্যে আমার ওস্তাদ সাহেব হতে সংগৃহীত কতকগুলো তালীকাত বা নোট আছে– তা আমার বড় পরিশ্রমলব্ধ বস্তু। এটি আমার নিকট থেকে খোয়া গেলে প্রবাসের এই দীর্ঘদিনের সকল কষ্টই বৃথা যাবে। দয়া করে আমার নোটগুলো আমাকে ফেরত প্রদানের নির্দেশ দিন। আমার অর্জিত সমস্ত বিদ্যা ওর মধ্যেই সঞ্চিত রয়েছে।"

দস্যু-সর্দার বালকের কথা শ্রবণ করে সহাস্যে বললেন ঃ "তুমি তো বেশ লেখাপড়া শিখেছ! অর্জিত বিদ্যা কাগজে সঞ্চিত রয়েছে, মনে কিছুই নাই, খুবতো পড়েছো!"

ইত্যাকার হাস্যকৌতুকান্তে দলপতি ইমাম সাহেবের লুণ্ঠিত নোটের দফরতটি তাঁকে ফেরত প্রদানের নির্দেশ দিলেন। দস্যু-সরদারের ব্যাঙ্গোক্তি তাঁর শিশু মনে এমন রেখাপাত করে যে, নিজের শিক্ষার উপর তাঁর ধিক্কার জন্মাল। ফলে তিনি তিন বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে নোটের সম্পূর্ণ দফতরটি কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। সে থেকে দফতরের লিখিত যাবতীয় বিষয় তাঁর স্মরণাপটে চিরতরে অঙ্কিত হয়ে গেল।

নিশাপুর নিজামিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন

ইমাম সাহেব আবু নসর ইসমাঈলের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করে গায্‌যালী সাহেব জন্মভূমিতে ফিরে আসলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান-পিপাসা এত প্রবল হয়ে উঠল যে, উচ্চ শিক্ষা লাভ না করে তিনি আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারলেন না। সে সময়ে খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুর শহরটি উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এই শহরেই সর্বপ্রথম আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এটি নিযামুল-মুলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে 'নিযামিয়া মাদ্‌রাসা' নামে খ্যাত প্রসিদ্ধ ছিল। সে সময় 'ইমামুল হারামাইন' উপাধিধারী জনৈক বিশ্ববরেণ্য অসাধারণ আলেম উক্ত মাদ্‌রাসার প্রধান শিক্ষকরূপে শিক্ষা দান করতেন। এই মহাপুরুষ মাদ্‌রাসায় শিক্ষা প্রদান ছাড়াও ধর্মীয় যাবতীয় বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। ওয়ায নসীহৎ, ইমামত, খতীব এবং সমস্ত মুসলিম রাজ্য কর্তৃক ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তিগুলোর তত্ত্বাবধানের ভার তাঁরই উপর অর্পিত ছিল। সে সময়ের সমস্ত মুসলমান বাদশাহ এবং সুলতানগণের নিকট তাঁর যথেষ্ট সম্মান ছিল। বাদশাহ ও সুলতানগণের ভুল মীমাংসাগুলোকে তিনি শুদ্ধ করে দিতেন। তাতে কেউ অসন্তুষ্ট হতেন না। তাঁর প্রতি জনসাধারণের ভক্তি এত প্রগাঢ় ছিল যে, বেয়াদবীর আশঙ্কায় কেউ তাঁর নাম মুখেও উচ্চারণ করত না। এ কারণে তাঁর প্রকৃত নাম অনেকেই বিস্মৃত হয়েছিল। কোন ঐতিহাসিক তাঁর প্রকৃত নাম আবুল মা'আলী কেউ বা আবদুল মালিক বলে উল্লেখ করেছেন। 'নেহায়াতুত্তালাবা' 'শামিলে বারাহীন' এবং 'ইরশাদুল মুগিছীল খালক্ক' এই মহাজ্ঞানীর রচিত গ্রন্থাবলরি মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ মহাপুরুষ অতিশয় ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। ইমাম গায্‌যালী এই মহাপুরুষের শিক্ষাধীনে থেকে অশেস যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে জ্ঞানার্জনের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন।

শিক্ষকতা

বাগদাদে তৎকালীন তুর্কীরাজ মালেক শাহের আধিপত্য ছিল। তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নিযামুলমুল্‌ক উপাধিধারী একজন অসাধারণ জ্ঞানী ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। এই মনীষীর প্রকৃত নাম ছিল হাসান ইবনে আলী।

তিনিও ছিলেন ইমাম গায্‌যালীর জন্মভূমি তুস জেলার অন্তর্গত রাযকান গ্রামের অধিবাসী। ইনি শিক্ষার উচ্চ শিখরে আরোহণ করে প্রথম এক সাধারণ সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হন। পরে নিজ কর্মদক্ষতা ও সততার গুণে বলখের শাসনকর্তার সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হন, ক্রমে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ কর্ম-নিষ্ঠার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পরলে মালিক শাহের পিতা আল্‌ফ আসালান এই বিচক্ষণ মহাপুরুষকে স্বীয় প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। উজির নিযামুলমুল্‌ক নিজেও অসাধারণ জ্ঞানী ও বিদ্বান ছিলেন এবং শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর উৎসাহের অবধি ছিল না। তাঁর নামানুসারে বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র 'মাদ্‌রাসায়ে নিযামিয়া'এবং এর পাঠ্যতালিকা 'দারসি নিযামী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই শিক্ষানুরাগী রাজপুরুষের আপ্রাণ চেষ্টার ফলেই নিযামিয়া মাদ্‌রাসার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি ইমাম গায্‌যালীর অসাধারণ ধী-শক্তি ও প্রতিভা সম্বন্ধে পূর্ব হতে জ্ঞাত ছিলেন। এখন তাঁকে একেবারে হাতের নিকট পেয়ে অতিশয় আনন্দিত হন এবং অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। বাগদাদের বিশ্ববিশ্রুত নিযামিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কামনা ইমাম সাহেবের অন্তরে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। নিযামুল মুল্‌কের দরবারে উপনীত হয়ে তিনি নিযামিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষকতা পদের বাসনা জ্ঞাপন করলেন। নিযামুল মুলক এতে খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। সে সময়ে কেউ রাজসভায় বিদ্বান সুধী-মণ্ডলরি সাথে বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনায় ও বিতর্কে জয়লাভ করতে পারলেই নিযামিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক পদের উপযোগী বলে বিবেচিত হতেন। ইমাম সাহেব এরূপ কয়েকটি বিতর্কেই জয়লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। এ সময় নিযামিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়।

অতএব, নিযামুলমুলক মহা আনন্দের সাথে ইমাম সাহেবকে ৪৮৪ হিজরীতে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৪ বৎসর। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে ইতোপূর্বে কোন আলেম এত অল্প বয়সে নিযুক্ত হওয়ার সম্মান লাভ করতে সমর্থ হন নি। এমন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তাঁর মান-মর্যাদা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল।

এমনকি, স্বয়ং বাদশাহ এবং রাজপুরুষগণ রাজকার্যের জটিল সমস্যায় তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

সাল্‌জুকী নৃপতিগণের বাগদাদ দখলের পর এতে বাগদাদে দুই সিংহাসন অর্থাৎ দু'টি বিভাগ স্থাপিত হয়। তুর্কীরাজ সাল্‌জুকীরা হলেন শাসন সংরক্ষণ বিভাগের কর্তা। আর নৈতিক শিক্ষা, চরিত্র গঠন বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান ছিল আব্বাসীয় খলীফাগণের পরিচালনাধীন। ইমাম সাহেব এই উভয় বিভাগের কর্মকর্তাদের নজরেই অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন। প্রাথমিক জীবনে তিনি স্বভাবতঃ সম্মান ও মর্যাদাপ্রিয় ছিলেন। বিশিষ্ট আলেমগণের উচ্চস্তরের সম্মান ও মর্যাদা দর্শনেও তাঁর তৎপ্রতি বাসনা জন্মে। বাগদাদে নিযামিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে তিনিও উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন।

রাজশক্তির উপর প্রভাব

এমন উচ্চপদে এত অল্প বয়সে নিযুক্ত হবার ফলে তাঁর নাম শীঘ্রই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পরে। এমনকি শাসক কর্তৃপক্ষও তখন সকল ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ ও ফতোয়া গ্রহণ করতেন এবং অনেক জটিল কাজে তাঁর পরামর্শকে তাঁরা অনেক মূল্যবান মনে করতেন। সেলজুক বংশীয় সুলতানগণের ও আব্বাস বংশীয় খলিফাগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি। সুলতানগণের হাতে ছিল শাসনভার এবং খলিফাদের হাতে ছিল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শাসন ভার। সেলজুক বংশীয় সুলতান মালিক শাহের ৪৮৫ হিজরী সনে বেসাল হলে দরবারের সভাসদগণ তাঁর চার বছর বয়স্ক পুত্র আহমদকে সিংহাসনে আরোহণ করালেন। তখন মুকতাদির বিল্লাহ বাগদাদের খলিফা নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর নিকট আহমদের নামে খুৎবা পড়ার অনুমতি চাওয়া হলে তিনি তুর্কীদের ভয়ে ভীত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন, কিন্তু খুৎবা একমাত্র বাগদাদের খলিফার নামেই পড়া হতো বলে তিনি অনুমতির সাথে সাথে ইমাম গায্‌যালী সাহেবকে তাঁর দূত হিসেবে তূর্কী কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেবের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ফলে তিনি তুর্কীদেরকে তাদের এই দাবী-দাওয়া ত্যাগ করালেন। তাতে ইমাম সাহেবের খ্যাতি আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল।

খলিফা মোকতাদির বিল্লাহর মৃত্যুর পর খলিফা মুসতাজহার বিল্লাহ খলিফা হলে তিনি 'বাতেনী ফিরকা' নামে একটি দলকে অত্যন্ত শক্তিশালী দেখিয়ে ইমাম সাহেবকে তাদের মতের বিরুদ্ধে একটি কিতাব রচনার জন্য অনুরোধ করলেন। বিশেষ অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি সেজন্য একটি কিতাব রচনা করে তার নাম অনুসারে এই কিতাবের নাম রাখলেন 'মুসতাজহারী'। তাঁরই রচিত কিতাব 'মুনকিজুম মিনাদ্দালাল' এই কথার উল্লেখ করেছেন।

ইমাম সাহেবের ওয়াজ নসিহত

ইমাম সাহেবের ওয়াজ মাহফিলে শত শত আলেম ও আমীর-ওমরাহ হাজির থাকত। হযরতের ওয়াজ এতই যুক্তিপূর্ণ, দলিলভিত্তিক ও ন্যায়সঙ্গত ছিল যে, শেখ সায়িদ বিন ফারেজ মা'রুফ এবং ইবনে লুব্বান তার প্রত্যেকের ওয়াজ সাথে সাথেই লিখে রাখতেন। তার এ ধরনের ১৮৩টি ওয়াজ একত্রে সঞ্চয়ন করে ইমাম সাহেবকে দেখালেন তিনি তা কিঞ্চিৎ সংশোধন ও পরিবর্তন এনে তার নাম রাখলেন 'মাজালিসে গায্যালিয়া'।

তাসাউফ সাধনা ও নির্জনতা অবলম্বন

ইমাম সাহেবের সংসার বিরাগ জীবন যাপন নতুন ধরনের এক ইতিহাস। তাঁর রচিত কিতাব 'আল-মুনকিজুম মিনাদ্দালাল'-এ তিনি তাঁর কারণ বিষদভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সাহেব কিশোর বয়সে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং তখন এই মাযহাবেরই শিক্ষা দীক্ষা তিনি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু রাজধানী বাগদাদে আগমনের পর তিনি সমস্ত মাযহাবের লোককে সেখানে দেখতে পেয়ে তাদের বিভিন্ন মাযহাব অনুযায়ী তাদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং তাদের সাথে আলোচনা দ্বারা তাদের মতামত জানতে লাগলেন। শিয়া, সুন্নী, মুতাজিলা, জিনদীক, মাজুসী, ঈসায়ী, কালামপন্থী ইত্যাদি বিভিন্ন দল তখন বাদগাদে উপস্থিত ছিল। তখন আস্তিকবাদ, নাস্তিকবাদ, জড়বাদ, দর্শন, মানতেক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান বিশ্বাস ও মতবাদের সমাবেশ হয়ে মুসলমান সমাজে বহু মতানৈক্যের সূত্রপাত হয়। তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে তর্কযুদ্ধ বা

মোনাজেরায় লিপ্ত হত। এতে ইমাম সাহেবের উপর এমন প্রভাব পরল যে তাঁর সমস্ত জীবনের রূপ পরিবর্তন হয়ে গেল। ইমাম সাহেব বলেন, "প্রথম থেকেই প্রত্যেক জিনিসকে যাচাই করে দেখা আমার অভ্যাস ছিল। সেজন্য মাযহাবের উপর আমার অটল বিশ্বাস আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে গেল। ছোটবেলা থেকে শুনতে শুনতে মনে যে বিশ্বাস জন্মেছিল, তা আস্তে আস্তে দূরে চলে যেতে লাগল। আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে লাগলাম এবং ভাবলাম যে, এ প্রকারের অন্ধ বিশ্বাস ইহুদী ও খৃস্টানও তা করে থাকে। প্রকৃত বিদ্যার ভেতর কোন সন্দেহ ও সংশয় থাকতে পারে না। যেমন এটা ধ্রুবসত্য যে, দশ তিন হতে বেশি। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, তিন দশ হতে বেশি এবং তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সে বলে আমি আমার লাঠিকে সাপে পরিণত করতে পারি। (সে তার লাঠিকে সাপে পরিণত করে তা দেখিয়ে দেয়), তখন আমি বলব যে, এতে সন্দেহ নেই যে, লাঠিকে সাপে পরিণত করা বড় একটি কঠিন ব্যাপার কিন্তু তবুও তিন হতে দশ বেশি– এই বিশ্বাস মনে থেকেই যাবে। তখন আমি চিন্তা করতে লাগলাম, এ প্রকার বিশ্বাস কোন্ সীমা পর্যন্ত যেতে পারে। জানলাম যে তা ইন্দ্রিয়লব্ধ এবং প্রাথমিক জ্ঞান। যখন জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকল, তখন ইন্দ্রিয়লবদ্ধ মতবাদের ভেতর আমার সন্দেহ হতে লাগল, এমনকি পরিশেষে কোন বিষয়ে আমার বিশ্বাস রইল না। এ অবস্থায় আমি দু'মাস অতিবাহিত করলাম। কিন্তু এরপর এ অবস্থা মন থেকে দূর হতে লাগল। তখনও নানান মাযহাব সম্বন্ধে যে সন্দেহ মনে উপস্থিত হয়েছিল, তা থেকে গেল। তখন ছিল চারটি প্রধান দল– কালামপন্থী, বাতেনী (তালেমী শিয়া), দার্শনিক ও সূফীদের দল। আমি এক একটি দলের মতামতের যাচাই ও অনুসন্ধান করতে লাগলাম। ইল্‌মে কালামের যত কিতাব ছিল, তা পড়লাম, কিন্তু তবুও মনে স্বস্তি পেলাম না। দর্শন শাস্ত্রের ভেতর যা বিশ্বাস করার বিষয় ছিল, তার সাথে মাযহাবের কোন সম্পর্ক নেই। যে অংশ মাযহাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলী, তারও বিশ্বাসের ভিত্তির উপর নয়। যে দল সমসাময়িক ইমামের উপর অন্ধ বিশ্বাস করত, তাদের নাম 'বাতেনী বা শীয়া' দল। অতঃপর যখন সূফী সাধনায় মননিবেশ করলাম তখন দেখতে পেলাম একমাত্র সূফীগণই হক পথে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। এ সম্পর্কে

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী (র) সূফীবাদ সম্পর্কে বলেন, "সুদীর্ঘ দশ বছর কৃচ্ছ সাধনার মাধ্যমে আমি সন্দেহাতীত ভাবে এ সত্যটি উপলব্ধি করেছি যে, সূফীমণ্ডলীই আল্লাহর একনিষ্ঠ সাধক, আল্লাহর পথের যথার্থ পথিক, তাদের তরীকাই হলো সবচেয়ে নিখুঁত তরীকা, তাদের নৈতিক চরিত্র মানবকুল শ্রেষ্ঠ জীবনধারা অতি স্বচ্ছ এবং তারা নিখুঁত ও উন্নততর নৈতিকতার অধিকারী, তাদের নৈতিকতা ও চরিত্র এতই বলিষ্ঠ ও উচ্চমানের যে, সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ও শরীয়ত বেত্তাদের যাবতীয় জ্ঞান গরিমার সমন্বয় করেও এর মোকাবেলা করা যাবে না। অনুরূপ বলিষ্ঠ চরিত্র কাঠামো রচনা করা সম্ভবপর হবে না। কারণ আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক নির্বিশেষে তাঁদের প্রত্যেকটি কাজ নূরে নবূয়তের দ্বারা স্নাত। এ নূরে নবুয়তকে বাদ দিলে আর কি আছে, যদ্বারা প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে?"

ফানাফিল্লাহ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ স্তর এতে সন্দেহ নেই। তবে তা কৃচ্ছতা সাধনার পরিণতির দিক থেকে, অন্যথায় এটাই আধ্যাত্মিকতার প্রথম সোপান, এর পূর্বে যা কিছু করা হয়, সবই এর প্রস্তুতি পর্বে গণ্য। ফানাফিল্লাহ থেকে দিব্যজ্ঞান ও দিব্য দৃষ্টির উন্মেষ ঘটে।

সূফীগণও এ সোপানে অনুপ্রবেশ করেই ধ্যানের (মুরাকাবা) মাধ্যমে ফেরেশতা ও নবীদের আত্মার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করেন, তাদের কথা শোনেন এবং তাঁদের সাহায্যে প্রকৃত জ্ঞান আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পান। শুধু তাই নয়। তাঁদের নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় এবং সৃষ্টি ও বস্তুজগতের উর্ধ্বে তাঁরা এমন একটি জগতের সন্ধান লাভ করেন যার অবস্থা ও প্রভাব ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তা বর্ণনার চেষ্টা করলে ত্রুটি বিচ্যুতি না হয়ে গত্যন্তর নেই। তাছাড়া সান্নিধ্য ও মিলনের বর্ণনাভঙ্গি বিশেষজ্ঞদের একান্ত নিজস্ব।

মোদ্দাকথা, যে ব্যক্তি তাসাউফের আলো পায়নি সে নবুয়তের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। মূর্খরাই সূফীবাদের বিবৃত তত্ত্ব ও তথ্যকে অস্বীকার করে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসে।

(আল মুনকিযু মিনাদ্দালাল)

—২

হযরত ফারমাদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ

স্বয়ং ইমাম গায্‌যালী (র) বলেন, "নির্জনবাস এবং রিয়াযতের নিয়ম আমি তাসাউফের কিতাবাদি থেকে শিখেছিলাম। কিন্তু যেহেতু কোন জ্ঞানই শুধু কিতাবপত্র থেকে পুরোপুরি অর্জিত হয় না; বরং সেজন্য কোন বিজ্ঞ শেখ তথা পীরের হাতে নিজেকে সমর্পণ (বাইয়াত) নিতে হয়।"

সমস্ত ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম সাহেব শেখ আবু আলী ফারমাদী (আফযাল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী)-এর হাতে বাইয়াত ছিলেন।

সন্তান ও মুরীদগণ

সংসার জীবনে দেখা যায় ইমাম সাহেবের কয়েকজন কন্যা ব্যতীত পুত্র সন্তান ছিল না। তন্মধ্যে শিওল মুনা নাম্মী একজন কন্যার নিম্নতম বংশদরের নাম শেখ মাজুদিন। ইমাম সাহেবর বহু সংখ্যক শাগরেদ ও মুরীদ ছিল। নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য– মুহাম্মদ বিন তাওমার্‌ত, আল্লামা আবু বকর আরাবী, কাজী আবু নসর আহমদ, ইবনে আবদুল্লাহ, আবুল ফাত্‌হা আহদ বিব আলী, আবুল মনসুর মুহাম্মদ বিন ইসমাইল, আবু ছাইদ মোহাম্মদ বিন আসয়াদ, আবু হামেদ, আবুল হাসান, আবু তালিব, আবদুল করিম প্রমুখ।

গ্রন্থ রচনায় ইমাম সাহেব

ইমাম সাহেব মাত্র ৫৪/৫৫ বছর জীবনকাল লাভ করেছিলেন। এরমধ্যে শৈশবকাল ও পাঠ্য জীবন বাদ দিলে মাত্র ৩৪/৫৫ বছর যাবৎ তিনি পুস্তকাদি রচনার সময় পেয়েছিলেন। এ সমান্য সময়ের মধ্যে তিনি ছোট বড় প্রায় চারশত পুস্তক রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'ইয়াকুতুত্যাবীল' নামক তাফসীরুল কুরআন খানি ৪০ খণ্ডে সম্পাদিত হয়েছে। লিখার জন্য যে ৫৪/৫৫ বছর সময় পেয়েছিলেন এর সম্পূর্ণ সময়টুকু এ কাজে ব্যয় করার সুযোগ পান নি। কারণ, দশ এগার বছর তিনি দেশ পর্যটন ও নির্জনবাসে (সূফী সাধনায়) অতিবাহিত করেছেন। বাকী ২৪/২৫ বছর সময়ও একাধারে পুস্তক রচনায় অতিবাহিত করেন নি। বরং অধ্যাপনা,

অধ্যয়ন, ধ্যান-সাধনা ইবাদতেও প্রতিদিন কিছু কিছু সময় অতিবাহিত করেছেন। তাঁর দরবারে শিক্ষার্থী ও দীক্ষার্থীর সংখ্যা কোন দিনই কম ছিল না।

ইমাম সাহেবের দ্রুত কলম চালনা সম্বন্ধে আল্লামা নববী বলেছেন, "আমি ইমাম গয্যালীর হায়াতে জিন্দেগী ও তাঁর রচিত পুস্তকাদীর পৃষ্ঠা হিসেব করে দেখলাম, তিনি প্রতিদিন গড়ে ১৬ পৃষ্ঠা লিখেছিলেন।"

ইমাম সাহেবের লিখিত কিতাবসমূহ

নিশাপুরে থাকাকালিন সময়েই ইমাম সাহেব মৌলিক গবেষণার সাথে পুস্তক রচনা শুরু করেন। ফলে অল্প দিনে তাঁর যশঃগৌরব চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। জুরজান শহরে শিক্ষারত থাকাকালে তিনি ওস্তাদ-এর বাতলে দেয়া পাঠ্য বিষয়ের নোট লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। যার ফলে সেখান থেকেই তাঁর গবেষণা ও রচনাশক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে।

ইতিহাসে দেখা যায়, নিশাপুরে অবস্থানকালেই তিনি জগৎ বিখ্যাত 'মুনখুল' (চালুনী দ্বারা চালিত) নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কালক্রমে মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাসে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি প্রবেশ করেছিল, তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে পর্যালোচনার মাধ্যমে সেগুলোকে চেলে বেছে আলাদা করা হয়েছে। গ্রীক দার্শনিকদের দ্বারা ইসলামের ধর্মীয় বিধান 'ফিকাহ্' শাস্ত্রের উপধারাসমূহে যে সমস্ত ভ্রম পূর্ণ ফালসাফা বা দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করেছিল, এ গ্রন্থের মধ্যে অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম যুক্তিপূর্ণ বিচারে সেগুলোকে প্রকৃত ইসলামী ফালসাফার সাহায্যে বেছে পৃথক পৃথক করে ফেলা হয়। এছাড়াও তিনি বহু কিতাব রচনা করেছেন এবং কোন কোন কিতাবের বহু খণ্ডও আছে। বিভিন্ন বিষয়ে তার রচিত কিতাবলীর ভিতর নিম্ন বর্ণিত গ্রন্থগুলো বিখ্যাত–

ফিকাহ শাস্ত্র ঃ ওয়াসীত, বাসিত, ওয়াযিয, তালিকাতুন ফি ক্ষরুয়িল মাযহাব, বয়ানুল কাওলাইনে লিশ্যাফেয়ী, খুলাসাত্যের রাসায়েল, গাইয়াতুল গাওর, ইখতিসারুল মুখতাসার, মাজমুরাতুল ফতোয়া।

ফিকার ওসুল ঃ তাহসীনুল মাখেজ, শিফাউর আলীল মুনতাখাল ফি এলমিল বাদালে, মনখুল মুসতাসফা, মুফাচ্ছালুল খিলাপ ফি ওসুরিল কিয়াস।

মানতিক ঃ মি'য়ইয়ারুল ইলম্, মাহাক্কুন নজরে, মিজানুল আমল।

দর্শন ঃ মাকাছেদুল ফালাসেফাহ, আল মুনকিজুম মিনাদ্দালাল।

কালাম ঃ তাহাফাতুল ফালাসিফাহ, এলযামুল আওয়াম, ইকতিসাদ, মুসতাজহারী, ফাজাইহুল ইবাহিয়াহ হাকিকাতুর রূহ, কেস তাসুল মুসতাকীম, আল-জামিল ফি রদ্দে আলা মান গাইয়ারাল ইঞ্জিল, মাহাহেবুল বাতেনীয়াহ, তাফরিকাহ বাইনাল ইসলামে ওয়া জানদাকাহ, রিসালাতুল কুদসিয়াহ।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ঃ এহ্‌ইয়াউল উলুম, কিমিয়ায়ে সায়াদাত, আলমুকসাদাতুল আক্‌সা আখলাকুল আবরার জাওয়াহেরুল কুরআন, জাওয়াহিরুল কুদ্দুস ফি হাকিকাতিন নফ্‌স, মিশকাতুল আবরার, মিনহাজুল আবেদীন, সিরাজুস সালেকীন, নসিহাতুল মুলুক, আইন্যাল ওলাদে, বেদাইয়াতুল হিদাইয়াহ, মিশকাতুল আনওয়ার।

তাফসীর ঃ 'ইয়াকুতুত্যাবীল' ৪০ খণ্ডে সমাপ্ত।

ইমাম সাহেবের বহু অমূল্য গ্রন্থ দগ্ধীভূত

জগতের অধিকাংশ লোক ইমাম সাহেবের ভক্ত ও প্রশংসাকারী থাকলেও তাঁর শত্রু সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। এক শ্রেণীর বিদ্বান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্বোধ ব্যক্তিরাই তাঁর শত্রু ছিল। এদের মধ্যকার কোন দুরাচার দুরভিসন্ধিমূলকভাবে 'মুনখুল' গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফার কুৎসা সংযোজন করে তা ইমাম গায্‌যালীর নামে চালিয়ে দিয়ে খলীফার দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আনে। ফলে 'মুনখুল' কিতাবটি পুড়িয়ে ফেলা হয়। বুদ্ধি ও জ্ঞানের পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং অকাট্য যুক্তির সাহায্যে যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে খড়্গ প্রয়োগ করেছিলেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাপিষ্ঠরা সে সমস্ত গ্রন্থের ভিন্নার্থ করে সর্বসাধারণকে ক্ষেপিয়ে সেই গ্রন্থগুলোও দগ্ধ করে ফেলেছে। এরূপে

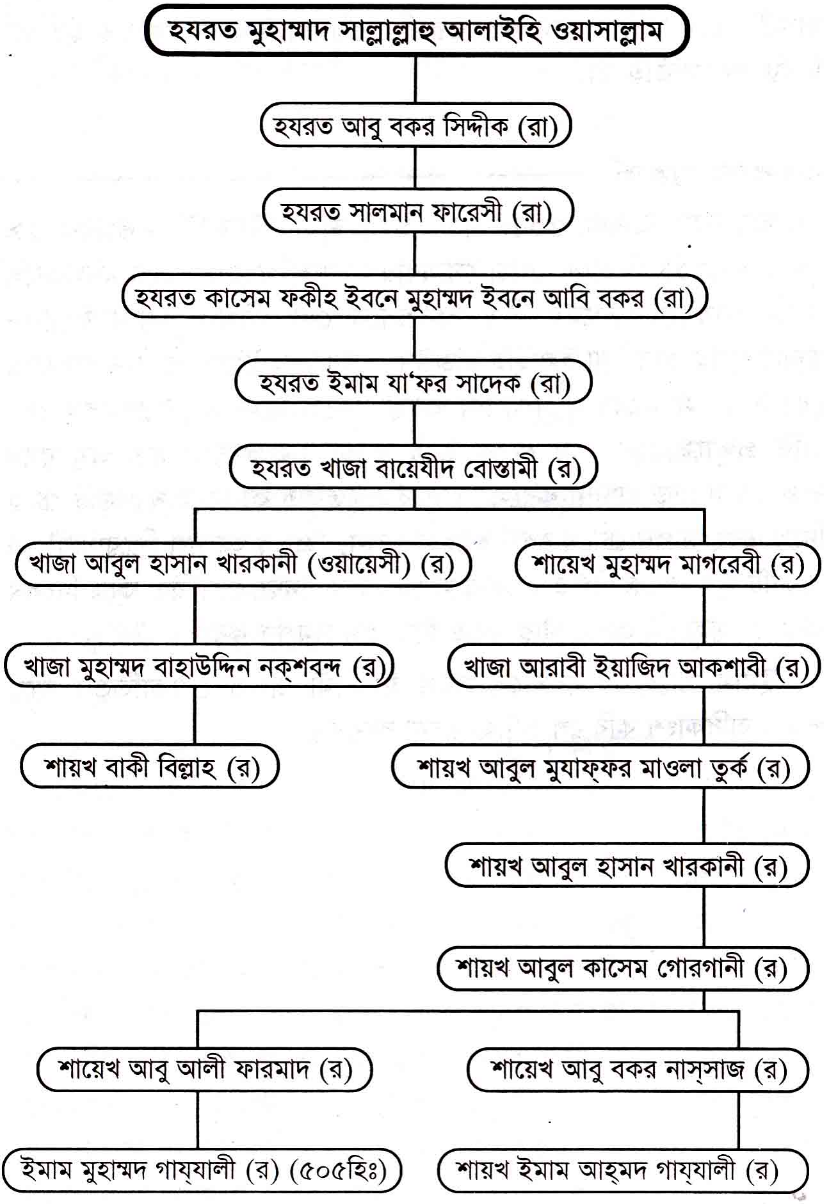
তাঁর বহু অমূল্য গ্রন্থ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইউরোপীয় মনীষীগণ এরমধ্যে হতে কয়েকটি গ্রন্থ কুড়িয়ে নিয়ে সযত্নে রক্ষা করেছেন। আধুনিক সভ্যতার উপর সে সমস্ত গ্রন্থের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার যাবতীয় গ্রন্থ রক্ষিত হলে জগতের কি পরিমাণ উপকার সাধিত হত তা নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন।

বেসাল মুহূর্ত

অবশেষে হিজরী ৫০৫ সালে ১৪ই জুমাদিউস্সানী মুতাবেক ১৯ ডিসেম্বর ১১১১ খ্রিস্টাব্দে রোজ সোমবার সকালে পঞ্চাশ বৎসর বয়সকালে ইমাম গায্যালী সাহেব স্বীয় বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন– ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। তাঁর ভাই ইমাম আহমদ গায্যালী (র) ইমাম সাহেবের মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন, "সোমবার দিন অতি প্রত্যুষে তিনি ঘুম থেকে উঠে স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস মত অযু করে ফজরের সালাত আদায় করলেন। পূর্বে প্রস্তুতকৃত কাফনের কাপড়টি চেয়ে নিয়ে এবং আপন চোখে স্পর্শ করে বললেন, "প্রভুর আদেশ শিরোধার্য', এ বাক্যটি মুখ থেকে নির্গত হওয়ার সাথে সাথে পদদ্বয় প্রসারিত করে দিলেন এবং সে মুহূর্তেই প্রাণ-স্রষ্টার হাতে স্বীয় প্রাণ সমর্পণ করলেন।"

ইমাম সাহেবের বেসালে সমগ্র ইসলামী জগত শোকাভিভুত হয়ে পরে। অধিকাংশ কবি শোকগাঁথা রচনা করেন।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী (র)-এর উর্ধ্বতন মুরশিদের নামের তালিকা



ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। যিনি আলো ছড়িয়ে দেন, দৃষ্টি শক্তি সম্প্রসারিত করেন, রহস্য প্রকাশ করেন এবং সামনের পর্দা উন্মোচন করেন। অতঃপর মহানবী হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সজস্র দরূদ, আপাদমস্তক যিনি আলোয় উদ্ভাসিত, মহান গুণে গুণান্বিত, পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রেমাষ্পদ, সর্বশ্রেষ্ঠ পাপ মোচনকারী এবং সর্বোচ্চ প্রতাপশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী; তাঁর অনুচর, বংশধর ও অনুগামীদের প্রতিও অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

আল্লাহর আলোর গুঢ় রহস্য জানার জন্য যারা উৎসুক, সার্থক হোক তাঁদের যাত্রা ও সাধনা, আর অবাস্তব চিন্তাধারা থেকে পবিত্র হোক তাঁদের হৃদয় কন্দর।

আপনারা আমাকে পবিত্র কুরআনের মাজীদের এই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন–

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

(সূরা নূর, আয়াত নং ৩৫)

আল্লাহর আলো শিশা, তাক, প্রদীপ এবং জলপাই বৃক্ষের সাথে কেন উপমা দেয়া হয়েছে? অথচ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "আল্লাহর আলো-আঁধারের সত্তরটি পর্দা আছে। যদি তিনি ঐগুলো অপসারণ করতেন, তবে তাঁর মহান আলোকরাশি প্রতিটি দর্শককে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করতো।"

এই প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে জটিল। এর দ্বারা এমন একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষ খোলার চেষ্টা করা হয়েছে, যা তত্ত্বজ্ঞানী আলেম ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি ছাড়া অপর কেউ খোলার স্পর্ধা রাখে না। এই কথাও সত্য যে, সব ধরনের রহস্য ব্যক্ত করা ও তার বর্ণনা দেয়া চলে না। আর প্রতেকটি নিগূঢ় বাণী না সাধারণের সামনে উন্মুক্ত করা হয়, না তা মুখে প্রকাশ করা যায়। একমাত্র মহৎ ব্যক্তিরাই এ রহস্যভেদ গোপন রাখতে পারেন।

কোন কোন তত্ত্বদর্শীর মতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহস্যোদঘাটন করা কুফরী। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেন– কোন কোন আলেম গুপ্তধন সমতুল্য। উলামায়ে রব্বানীই তাঁদের চিনেন; অন্য কেউ নয়। আর যারা আল্লাহর মারেফত থেকে বঞ্চিত, কেবল তারাই তাঁদের অমূল্য বাণী অস্বীকার করতে পারেন এমন অবুঝদের সংখ্যা বেশি হলে রহস্য-ভেদ গোপন রাখাই উচিত।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেহেতু আপনাদের হৃদয় আলোয় আলোকিত, বিবেক গৌরব গর্ব থেকে পূতপবিত্র, সেহেতু আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আলোর একটি স্বচ্ছ দিক বর্ণনা করার প্রয়াস পাবো। অপরাপর দিকগুলোর সূক্ষ্ম তত্ত্বাদি সুধুমাত্র কেবল আকারে ইঙ্গিতেই বুঝতে হবে। কারণ জ্ঞানান্বেষীদের থেকে জ্ঞান গোপন যেমন অন্যায়, অযোগ্যদের নিকট জ্ঞানের গোপনীয়তা প্রকাশ করাও তেমনি অন্যায়।

কবির ভাষায়–

فَمَنْ مَنَحَ الْجُهَّالَ عِلْمًا اَضَاعَهُ
وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِيْنَ فَقَدْ ظَلَمَ

"মূর্খের যেজন ইলম শিখালো নষ্ট করিল তায়
জ্ঞান পিয়াসীরে দানে না যে জ্ঞান যুলুম করিল হায়।

এখানে আমি আমার আলোচনা অতি সংক্ষেপে, ইশারায় ও ইঙ্গিতে আপনাদের নিকট তুলে ধরবো। কেননা, একদিকে সময় সংকীর্ণ, অন্যদিকে আমার মন দ্বিধাগ্রস্থ। মনের চাবি তো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই হাতে। যখন ইচ্ছে, তখন তিনি তা নিঃসঙ্কোচে খুলে থাকেন। এই গ্রন্থে আমি শুধু তিনটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রথম অধ্যায়

نُوْر বা আলোর প্রকারভেদ

আল্লাহ রব্বুল আলামীনই একমাত্র আলোর উৎস। এ ছাড়া অন্যদের বেলায় 'আলো' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, বাস্তব অর্থে নয়।

প্রথমতঃ নূর বা 'আলো' শব্দটির তিনটি অর্থ রয়েছে। যেমন–

ক. সাধারণ ব্যক্তির নিকট;
খ. বিশেষ ব্যক্তিদের নিকট এবং
গ. বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট।

আবার এই নূর বা আলোর বিভিন্ন স্তরও রয়েছে। মোটকথা, আল্লাহ রব্বুল আলামিনই চরম বা চূড়ান্ত আলো, পরম নূর। তিনিই সত্যিকার ও প্রকৃত একক জ্যোতি এবং অন্য কেউ শরীক নেই।

সাধারণের দৃষ্টিতে نُوْر বা আলো

সাধারণের দৃষ্টিতে নূর বা আলো মানে 'প্রকাশ' বা 'পরিদৃশ্যমান জগত'। আর প্রকাশ হচ্ছে একটি সম্বন্ধযুক্ত ক্রিয়া। কারণ এখানে প্রতিটি বস্তুই অপরটির নিকট প্রাকাশিতও হয় আবার তা অপরটি হতে অদৃশ্যও হয়ে যায়। এই দিক দিয়ে এর প্রকাশ ও গোপন দুটোই সম্বন্ধযুক্ত। সাধারণের নিকট পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্যে দৃষ্টি শক্তির সাথে এর নিকট সম্বন্ধ রয়েছে।

সৌন্দর্যের দিক দিয়ে বস্তুগুলো তিনভাগে বিভক্ত। যেমন–

১. যা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন– কালো বস্তু।
২. যা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় বটে, কিন্তু তা দিয়ে অন্য কোন বস্তু দেখা যায় না। যেমন– উজ্জ্বল বস্তু, নক্ষত্র, অনুজ্জ্বল আগুন।
৩. যা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় এবং তা দিয়ে অন্য বস্তুও দেখা যায়। যেমন– চন্দ্র, সূর্য, স্ফুলিঙ্গ; অগ্নি, প্রদীপ ইত্যাদি। এ তৃতীয় প্রকারই 'আলো' নামে পরিচিত।

কখনো কখনো উজ্জ্বল বস্তু থেকে বস্তুর উপর প্রতিফলিত আলোকে 'আলো' বলা হয়। যেমন বলা হয়, পৃথিবী আলোকিত হয়েছে অথবা সূর্যালোক পৃথিবীকে আলোকিত করেছে। এগুলোকে নূর বা 'আলো' বলা হয়।

সংক্ষিপ্তাকারে বলা যেতে পারে, যে বস্তু মূলতঃ দৃষ্টিগোচর হয় এবং তা দিয়ে অন্য বস্তুও দেখা যায়, তাকেই 'আলো' বলে।

নূর বা আলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– প্রকাশ ও দর্শন। আর এই প্রকাশ ও দর্শন নির্ভর করে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চোখের ওপর। আলো প্রকাশ পেলে এবং অন্য বস্তুকে প্রকাশিত করলেও অন্ধ বা দৃষ্টিহীন ব্যক্তির নিকট তাতে কোনো উপকার আসে না। নূর বা 'আলো' শব্দ দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা আলো দেখার যন্ত্র চোখকেই বুঝি। আর এ কারণেই তত্বানুসন্ধানীরা দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চোখের আলোকে 'আলো' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাই চামচিকে সম্পর্কে বলা হয় যে, তার চোখের আলো ক্ষীণ বা দুর্বল। অন্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, তার চোখের আলো উবে গেছে। চোখের আলোকে কেন্দ্রীয়ভূত করে এবং তাকে সবল করে। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চোখের চার ধার বেষ্টন করে এর আলোকে কেন্দ্রীভূত করতে পারে।

চোখের সাদা অংশটি চোখের আলো বিক্ষিপ্ত করে এবং এতে করে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। ফলে সূর্যের তীব্র আলোর দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। যদিও এটা সাময়িক ব্যাপার, তবুও সবলের সামনে দুর্বলের নিস্তেজ হবার একটা উপমা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চোখকেই 'আলো' বলা হয়। এর নাম কেন 'আলো' হলো? এবং এ নামেরই বা কি সার্থকতা রয়েছে? এ সব ধারণা বিশিষ্ট ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট সুস্পষ্ট। মারেফাত হীন লোকদের জন্য এ আলোচনা নয়।

দৃষ্টিশক্তির ক্রুটি বর্ণনা

চোখের আলোর কয়েকটি ক্রুটি রয়েছে। যেমন– এটি অপরকে দেখতে পায় বটে, কিন্তু নিজেকে দেখে না। এমনিভাবে তা অতি দূরবর্তী বস্তু এবং অতি কাছের বস্তু দেখতে পায় না। অনুরূপ পর্দার বাইরের বস্তুও দেখতে পায়, কিন্তু ভেতরের ও অপ্রকাশ্য অংশ দেখতে পায় না। পরিদৃশ্যমান বস্তুর কোনোটি সে দেখতে পায়, কোনোটি সে দেখতে পায় না। এটি সসীমকে দেখতে পায়, কিন্তু অসীমকে দেখতে পায় না। কখনো এটি দর্শন করতে ভুলও করে! বড়কে ছোট আবার ছোটকে বড়। কিংবা দূরকে কাছে, স্থিরকে চলন্ত এবং গতি সম্পন্নকে স্থির বলে বাহ্যত প্রত্যক্ষ করে। এসব থেকে বুঝা যায় যে, চোখের আলোর উপরিউক্ত সাতটি ক্রুটি বা অক্ষমতা রয়েছে।

পূর্বের আলোচনায় এটিই প্রমাণিত হয়, মানুষের মনে পরিপূর্ণ গুণসম্পন্ন একটি চোখ রয়েছে, যাকে বোধশক্তি আধ্যাত্ম, মানবীর আত্মা বলা হয়। অর্থাৎ যে গুণ দিয়ে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোককে দুধের শিশু, উন্মাদ ও চতুষ্পদ জীব বা জানোয়ার হতে পৃথক করা যায়, তাকেই চোখ বলে। সর্বসম্মত পরিভাষায় এটি 'বুদ্ধি' বলে অভিহিত। আমি মনে করি প্রকাশ্য চোখের চাইতে বুদ্ধিকেই নূর বা আলো বলা অত্যন্ত সমীচীন। কারণ, বুদ্ধি প্রোগুক্ত সাতটি দোষ হতে একেবারেই মুক্ত।

চোখ ও বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্যসমূহ

চোখ ও বুদ্ধির মধ্যে সাতটি পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে–

১. চোখ নিজেকে দেখতে পায় না। নিজের গুণেরও সে সম্যক জ্ঞান রাখে। বুদ্ধি নিজেকেও দেখতে পায়। অপরকেও দেখতে পায়। বুদ্ধিতে জ্ঞান ও শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে। এটি শুধু নিজের জ্ঞান সম্বন্ধেই সচেতন নয়, বরং এর জ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান, এর জ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের জ্ঞান এভাবে অনেক দূরের জ্ঞান সম্বন্ধে এটি সচেতন।

২. চোখ খুব কাছের ও খুব দূরের বস্তু দেখতে পায় না। কিন্তু বুদ্ধির কাছে 'নিকট দূর' সমান। এটি চোখের নিমিষে আকাশে যেতে পারে আবার পাতালেও প্রবেশ করতে পারে। এটি বস্তুর 'নিকট দূর' এর ধারে কাছেই শুধু নয়, বরং সর্বত্র বিরাজমান। বোধ শক্তি, বুদ্ধি আল্লাহর মহাসমুদ্রের একটি উদাহরণ বা উপমা বিশেষ। এটি মূল বস্তু আল্লাহর সাদৃশ্য হতে পারে, কিন্তু সমান হতে পারে না। এ থেকে–

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ -

"আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ)-কে আপন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।"

হাদীস শরীফটির অর্থ আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। অর্থাৎ এখানে আদম (আ)-কে আল্লাহর আকৃতির সাদৃশ্য বলা হয়েছে বটে। কিন্তু সমান বলা হয়নি।

৩. চোখ পর্দার আড়ালের বস্তু দেখতে পায় না। কিন্তু বোধ শক্তি আকাশের ও পৃথিবীর অভ্যন্তর, ফেরেশতা জগত পর্যন্ত আপন জনের মতো পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। এটি বস্তুর প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে। তার সামনে যবনিকার বেড়াজালের বস্তু পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠে। তবে হ্যাঁ,

কখনো প্রতিকুল অবস্থার দরুণ এটি অকর্মণ্যও হয়ে পরে। যেমন চোখের পলক বন্ধ করলে চোখ তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। অত্র পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে এর বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

৪. চোখ বস্তুর বাইরের ছাঁচ ও আকার দেখতে পারে, কিন্তু ভেতরের অংশ দেখতে পারে না। তা উপলব্ধি করতেও পারে না। অপরদিকে, বুদ্ধি বাইরের ভেতরের সব কিছুই দেখে, বাস্তব উপলব্ধি করতে পারে, কার্য ও কারণ বুঝে তার নির্দেশনা দেয়। বস্তুটি কি হতে সৃষ্টি হয়েছে? কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? সৃষ্টির কাজে কতকগুলো উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে? এর উপকার বা অপকার কি? বুদ্ধি এমনি অসংখ্য অজানার সন্ধান দিতে পারে!

৫. চোখ কোনো কোনো সৃষ্ট বস্তু দেখতে পায়, কিন্তু সকল ধরনের অনুভূতি থেকে সে বঞ্চিত। এটি শব্দ, সুগন্ধি, সাদ, তাপ, শৈত্য এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে গন্ধ শ্রবণ বুঝে না। চোখ আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, কষ্ট, শ্রম, প্রেম, মহব্বত, শক্তি, ইচ্ছা, জ্ঞান, মূর্খতা ইত্যাদি মানবিক অবস্থা আদৌ দেখতে পায় না। চোখের বিচরণ ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত। অপরদিকে বুদ্ধির রাজ্য বিশাল ও বিস্তীর্ণ। তার বিচরণ ভূমি অসীম অনন্ত। সে সমস্ত সৃষ্ট বস্তু দেখতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে। অন্তর্নিহিত অর্থ টেনে বের করতে পারে। এই দিক দিয়ে সে নিজেই সয়ং সম্পূর্ণ।

চোখের চেয়ে বুদ্ধির উপলব্ধি অনেক বেশি একথা সত্য। কিন্তু তাই বলে এর রাজ্য অসীম নয়– সসীম। জান্নাত, জাহান্নাম, পুলসিরাত, উচ্চতর জগত রূহ-জগত, বুদ্ধি দেখতে পায় না। এ সম্পর্কে সে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে না। কোনো বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তি ওসব ব্যাপারে কিছু অভিমত পেশ করলেও তা সংশয় মুক্ত নয়। কারণ

মানুষের বুদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের। প্রতিটি বুদ্ধি তার নিজস্ব ধাঁচে ধাবিত হয়। তাই বুদ্ধিই চূড়ান্ত একথা ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ, চোখের চাইতে বুদ্ধির বিচরণ ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত একথা অতি সত্য।

এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, চোখ বুদ্ধির সমকক্ষ হতে পারে না। এ কারণে তাকে নূর বা 'আলো' বলা যায় না। অবশ্য অন্যদের তুলনায় এটি একটি 'আলো'। কিন্তু বুদ্ধির তুলনায় এটি একটি আঁধার। দৃষ্টিশক্তি হচ্ছে বুদ্ধির সংবাদবাহীদের অন্যতম। সে বুদ্ধির নিকট কেবল রূপ-রঙেরই সংবাদ দেয়। বুদ্ধি তার ইচ্ছে মতো তাতে নির্দেশ বর্তায়। এ ব্যতীত কল্পনা, চিন্তা, স্মরণ-স্মৃতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রবণ বুদ্ধির খাদিম হিসেবে কাজ করে। সম্রাট যেমন তাঁর ভৃত্যদের বন্দী করেন, বুদ্ধিও তেমনিভাবে এদের আটক করে। এর বিস্তারিত আলোচনা আমার প্রণীত 'এহইয়াউল উলুম' গ্রন্থের 'আজায়িবুল কলব' অধ্যায়ে সংযোজিত করেছি।

৬. চোখ অসীমকে দেখতে পায় না। অন্য দিকে বুদ্ধি তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। বুদ্ধি অজানা ভাবধারাকে কাছে টেনে আনতে পারে তার উপর অজস্র চিন্তাধারা ফলাতে পারে। অসীমকে সে বুঝতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত কেউ অসীম নেই। অন্য কারো বেলায় অসীমত্বের কল্পনা করাও যায় না। তবুও বুদ্ধি যে অসীমকে জানতে পারে, তার অর্থ হচ্ছে মানবীয় বুদ্ধি যাকে সসীম মনে করে, কেবল সেই অসীমকে বুদ্ধি উপলব্ধি করতে পারে।

উদাহরণতঃ বলা যায় যে, গণিতশাস্ত্র এমন একটি শাস্ত্র, যা অসংখ্য সংখ্যা নিয়ে গঠিত। এক হতে উর্ধ্বতম সংখ্যার কোনো সীমানা নেই। তাই তা অসীম। কিন্তু গণীত সাস্ত্রের আবিষ্কারক মানুষ হচ্ছে সসীম। অতএব

সসীমের আবিষ্কৃত সংখ্যা অসীম হতে পারে না, সসীম হতেই বাধ্য। তবুও মানুষের বুদ্ধির নিকট ঐ সংখ্যাগুলো অসীম বলে তাকে অসীম আখ্যা দেয়া হয়েছে। দার্শনিকগণ বলে থাকেন, প্রতিটি বস্তুর একটি সীমা আছে। আর না হোক একটি বুদ্ধি ভিত্তিক সীমা তো অবশ্যই রয়েছে।

৭. চোখ বড় জিনিষকে ছোট ধারণা করে। সূর্যকে একটি ঢাল এবং নীলাকাশের বিক্ষিপ্ত নক্ষত্ররাজিকে রূপালী পয়সা বলে ধারণা করে– কিন্তু বুদ্ধি জানে যে সূর্য ও নক্ষত্র পৃথিবীর তুলনায় বহু বহু গুণে বিশাল। চোখ তারা ও ছায়াকে অনড় দেখে; একটি বালককেও সে তাই দেখে। কিন্তু বুদ্ধি উপলব্ধি করে, বালক আরো বেড়ে চলেছে, ছায়া নড়ে চড়ে লম্বা হচ্ছে এবং তারা প্রতিমুহূর্তে বহু যোজন দূরে চলে যাচ্ছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি হাদীস আছে। যেমন– রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'সূর্য কি চলেছে?'

তিনি উত্তরে প্রথমে 'না' পরক্ষণেই 'হ্যাঁ' বলেছিলেন। এতে রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্ময়বোধ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'এ উত্তরের অর্থ কী?'

জবাবে জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, 'আমার না, হ্যাঁ' বলা সময়ের মধ্যে সূর্য পাঁচশো বছরের পথ অতিক্রম করেছে।'

চোখের অনেক ভুল-ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু বুদ্ধির তা নেই। সত্যিকার বুদ্ধির ভুলত্রুটি নেই– একথা সর্বতোভাবে সঠিক। কেননা যত ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, বিশ্ব যত দুর্যোগ ও বিপর্যয় হচ্ছে এর মূলে রয়েছে অসৎ বুদ্ধির বিভ্রান্তি। অসৎ বুদ্ধি কোনো একটি জিনিষকে উত্তম মনে করে, অথচ সৎ বুদ্ধির দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, তা উত্তম নয়। অনুরূপ এর ব্যতিক্রমও হয়। এ সম্পর্কে কুরআনের এ আয়াতটি উল্লেখযোগ্য–

عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَخَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ـ

অর্থাৎ, (বাহ্যত) কখনো তোমরা কোনো কিছুকে খারাপ মনে করো, অথচ তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক, আবার কখনো তোমরা কোনো কিছু পছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য অমঙ্গলকর।

এমনো দেখা যাচ্ছে যে, কেউ অসৎ বুদ্ধি প্রয়োগ করে কোনো একটি কাজের চিন্তা-ভাবনা করলো, অথচ তা উৎসন্নে গেলো। অন্য দিকে কেউ সৎ বুদ্ধিতে কাজ করে সাফল্য অর্জন করলো। অনেক বুদ্ধিমান প্রতারিত হচ্ছে, কপর্দকহীন হচ্ছে। আবার অনেক নির্বোধ ব্যক্তি কোটিপতি হচ্ছে। এ থেকে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, বুদ্ধিরই ভুল-ক্রুটি রয়েছে। এর উপর নির্ভর করা যায় না। তবে সৎ বুদ্ধির জয় সর্বত্র ধ্বনিত হচ্ছে।

যদি এ প্রশ্ন উঠে, অনেক বুদ্ধিজীবিকে দেখা গেছে যে, তাঁরা তাঁদের পদক্ষেপে ভুল করেন; তবে এর উত্তরে বলা যায় যে, তাঁদের ধ্যান ধারণা যখন বুদ্ধির সাথে যোগ দেয়, তখন তাঁরা মনে করে যে, এটা বুদ্ধির কাজ। আসলে সেটা বুদ্ধির ফসল নয়, বরং সেটা তাঁদের ধারণার ভুল। এর মধ্যে বুদ্ধিদাতার অদৃশ্য হাত রয়েছে। আমি এর ব্যাখ্যা জ্ঞানের মাপকাঠি ও বুদ্ধির দৌড় নামেক কিতাবে আলোচনা করেছি।

চিন্তা ধারণামুক্ত প্রকৃত বুদ্ধিতে ভুল হতে পারে না। তখন তা প্রকৃত অবস্থা অবলোকন করতে সক্ষম হয়। তবে চিন্তা, কল্পনা মুক্ত বুদ্ধি বিরল, নেই বললেই চলে। বেসালের পর চোখের পর্দা উন্মোচিত হবে। সব রহস্য বেরিয়ে পরবে। সবাই আপন আপন ভালো-মন্দ সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে নিজের আমলনামাও দৃষ্টিগোচর হবে।

দেখুন পাক কালামে মাজিদ কি বলে–

لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهُ ـ

অর্থাৎ, "ছোট-বড় কোন কিছুই এ থেকে বাদ পরবে না বরং সবই গণনা করা হয়েছে।"

কিয়ামতের ময়দানে বান্দাদের বলা হবে–

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ـ

অর্থাৎ, “আমি তোমার চোখের পর্দা উন্মোচন করলাম। তাই আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর হলো।”

অন্ধবিশ্বাসী ও কল্পনা বিলাসী ব্যক্তিরা তখন বলে উঠবে, “প্রভু! আমরা আপনার সব নির্দেশ মেনে নিচ্ছি। আমাদের সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। আমাদের আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিন। আমরা সৎকর্ম করবো।”

বুদ্ধির দর্শন এক নয়

বুদ্ধি সত্যিই দেখতে পায়। কিন্তু দৃষ্টি বস্তুগুলো একই স্তরের নয়। কোনো কোনো বস্তু সম্পর্কে তার জ্ঞান স্বতসিদ্ধ। যেমন– একই বস্তু পুরাতন ও নতুন হতে পারে না। একই জিনিষ অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব হতে পারে না। একই কথা সত্য ও মিথ্যা হতে পারে না। আবার যেখানে শব্দের বিশেষ অর্থ পাওয়া যায় সেখানেই তার সাধারণ অর্থও পাওয়া যায়। এটাও জ্ঞান স্বতসিদ্ধ। কালো কথাটি শুনলেই রংয়ের ধারণা চলে আসে। মানুষ শব্দটি শুনলেই প্রাণীর ধারণা আসে। এসবও বুদ্ধির ক্ষেত্র। কিন্তু এর উল্টো দিকটা বুঝানো স্বাভাবিক নয়, যেমন রং বললে শুধু কালোকেই বুঝায় না, প্রাণী বললে শুধুমাত্র মানুষকেই বুঝান হয় না।

কোনো কোনো বিষয়ের সাথে বুদ্ধি ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়। তখন একে ঝাকিয়ে জাগাতে হয়; লোহার উপর আঘাত করে এর স্ফুলিঙ্গ বের করতে হয়। দার্শনিকদের কালাম দিয়ে উৎসাহিত করতে হয়। তখনই মানুষ আলোয় স্নান করে দিব্য জ্ঞান লাভ করে।

সাধারণভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কালাম এবং বিশেষভাবে কুরআন মাজীদ সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন। পাক কালামের আয়াতের সাথে বুদ্ধির তেমন সম্পর্ক, যেমন সূর্যালোকের সাথে দৃষ্টি শক্তির সম্বন্ধ। এই সূর্যালোক দ্বারা দৃষ্টি শক্তির কাজ সাধীত হয়। তাই একে যেমন নূর বা 'আলো' বলা হয়, কুরআন মাজীদকেও সেরূপ যথার্থভাবে নূর বা 'আলো' বলা হয়।

—৩

কুরআন হচ্ছে সূর্যালোকের মতো এবং বুদ্ধি হচ্ছে চোখের আলোর ন্যায়। এটা হৃদয়ঙ্গম হলেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিম্নোক্ত কালামের অর্থ সহজে উপলব্ধি করা যায়।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِالَّذِیْٓ اَنْزَلْنَا قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ـ

অর্থাৎ, "অতএব তোমরা আল্লাহর রাসূলের প্রতি এবং আমি যে নূর বা আলো অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি।"

ফলাফল

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, চোখ দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন–

১. বহির্চোখ।

২. অন্তর্চোখ।

প্রথমটি ইন্দ্রিয় জগত এবং দ্বিতীয় স্বর্গীয় জগতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। আবার চোখের দৃষ্টিশক্তি পূর্ণতার মানষে প্রতিটি চোখের জন্য সূর্য ও আলো রয়েছে। সূর্যও দু'টি। একটি যাহেরী (প্রকাশ্য), অপরটি বাতেনী (অপ্রকাশ্য)। যাহেরী সূর্য দেখা যায়, বাতেনী সূর্য কুরআন ও মহান আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ গ্রন্থাবলি।

এ সব কথা যদি পরিপূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহলে স্বর্গীয় জগতের একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। সে জগতের আশ্চর্য দৃশ্যের নিকট এ দুনিয়ার সমস্ত কিছু তুচ্ছ ও নগণ্য। যে ব্যক্তি স্বর্গীয় জগতের ধার ধারে না অথচ এই হীন জগতের মায়া ও লোভ নিয়ে সদা ব্যস্ত, সে শুধু নরাধম

পশুই নয়, পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট। কেননা, পশুকে তো স্বর্গীয় জগতের চিন্তা ও বিচরণ করার শক্তিই দেয়া হয়নি। তাই আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালা বলেন–

اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ـ

অর্থাৎ, "তারা পশুর ন্যায় বরং তারা এর চেয়েও পথভ্রষ্ট অধম।"

ফলের তুলনায় খোসা, আত্মার তুলনায় রূপ-আকৃতি, আলোর তুলনায় আঁধার, উত্থানের তুলনায় পতন যেরূপ, স্বর্গীয় জগতকে আধ্যাত্মিক জগত, আলোর জগত ও উচ্চতর জগত বলা হয়। আরেক দিকে নিম্নতর জগতকে বস্তুতান্ত্রিক জগতও অন্ধকার জগত বলা হয়।

এখানে উচ্চতর জগত বলতে আমাদের মাথার উপর আকাশকে বুঝানো হয়নি। যদিও এ বস্তুতান্ত্রিক জগতের তুলনায় তা উচ্চে অবস্থান করছে। যখন এই পৃথিবী অন্য পৃথিবীতে এই আকাশ অন্য আকাশে রূপান্তরিত হবে, তখন মানুষের কাছে স্বর্গীয় জগতের দ্বার উন্মোচন হবে এবং সে তখন স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত হবে। যা মানুষের চিন্তা ভাবনার নিম্নস্তরে তা পৃথিবী, আর যা তার চিন্তাধারার ঊর্ধ্বে বিরাজ করছে, তা-ই তার নিকট আকাশ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এ পথে অগ্রসর হয়, তার জন্যই এ পথটি হচ্ছে প্রথম মিরাজ।

মানুষ নিম্নতর জগতের অধম। আবার সে উচ্চতর জগতেও প্রবেশ করতে পারে। আল্লাহর সাথে মালাইকা বা ফেরেশতার সম্পর্ক রয়েছে বলে তারা স্বর্গীয় জগতের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য তাদের কেউ কেউ নিম্নতর জগতের দিকেও ধাবিত হয়। এ জন্যই রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকে আঁধারে সৃষ্টি করেন, তারপর তাতে আপন আলো-জ্যোতি বিস্তার করেন।"

রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালার এমন কিছু ফেরেশতা রয়েছে, যারা মানুষের কর্ম সম্পর্কে মানুষের নিজেদের চাইতেও বেশি ভালো জানে। নবীগণ স্বর্গীয়

জগতে আরোহণ করতে পারেন এবং সেখান থেকে তাঁরা অদৃশ্য জগত দেখতে পান। যে ব্যক্তি স্বর্গীয় জগতে আছেন, তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অতি নিকটেই আছেন। তাই তিনি অদৃশ্য জগতে দেখতে পাচ্ছেন। স্বর্গীয় জগত হতেই এই মর্ত্য জগতের সকল কিছু বৃত্তের মতো আবর্তিত হচ্ছে। এ দু'জগতের সম্পর্ক হচ্ছে ছায়া-কায়া, ফল-ফলাধারী বৃক্ষও কারণ, কর্তার মধ্যকার সম্পর্কের মতো। মর্ত্য জগত হচ্ছে স্বর্গীয় জগতের বিমূর্ত প্রতিক। এ সম্পর্কে মিশকাত, মিসবাহ ও শাজারার আলোচনা দ্রষ্টব্য। যে এ সব আলোচনা বুঝতে পারবে, সে পবিত্র কুরআন মাজীদের উপমা অতি সহজেই বুঝতে বা অনুধাবন করতে পারবে।

উপলবিদ্ধ করুন

আমি বলছি, 'যে বস্তু নিজেকে এবং অন্যকে দেখতে পায়' এ কথা না বলে বরং 'যে বস্তু অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে' তাকে নূর (আলো) বা উজ্জ্বল প্রদীপ বলাই শ্রেয়। কেননা এর আলো অন্যের প্রতিও প্রতিফলিত হয়। রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরমধ্যে এ বৈশিষ্ট্য ছিলো। নবীগণ সবাই প্রদীপ। আলেমগণও একই। তবে এ দু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

লক্ষ্য করুন

দৃষ্টিশক্তির নূর বা আলো যা থেকে বের হয়, তাকে যদি উজ্জ্বল প্রদীপ বলা হয়, তাহলে যা থেকে ঐ প্রদীপ নিজে আলো প্রাপ্ত হয়, তাকে অগ্নি বলা অধিক সঠিক। এ পার্থিব প্রদীপ মূলতঃ উচ্চতর আলোকমালা থেকে আলোকিত। রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহ মোবারক কখনো হঠাৎ উজ্জ্বল হতো! অথচ তাতে অগ্নি স্পর্শ করতো না। যদি অগ্নি তা স্পর্শ করতো, তবে তো আর কথাই নেই- দীপ্ত প্রদীপ্ত হতো। অতএব, জাগতিক আলোর মূল হচ্ছে স্বর্গীয় আলো। এই সম্পর্কে হজরত আলী (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালার একজন

সত্তর হাজার চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতা আছেন। তাঁর প্রতিটি চেহারায় সত্তর হাজার মুখ রয়েছে এবং প্রতিটি মুখে সত্তর হাজার জিহ্বা রয়েছে। তা দিয়ে তিনি মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। তিনি একাই সকল ফেরেশতার মোকাবিলা করছেন। অন্যান্য ফেরেশতাদের সাথে এর মর্যাদার পার্থক্য দেখিয়ে বলা হয়েছে–

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ـ

অর্থাৎ, "যেদিন আত্মা ও ফেরেশতারগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবেন।"

এর শ্রেণীই হবে আলাদা। এ স্বর্গীয় আত্মাকে যদি জড় জগতের আলোর উপাদান বলে বিবেচনা করা হয়, তবে তাঁকে অগ্নির সাথে উপমা বা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। তূর পর্বত ব্যতীত ও আগুন দৃষ্টিগোচর হয়নি।

এই আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফেরেশতা নবীগণের চাইতেও উত্তম। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নবীগণ ফেরেশতাগণের চেয়েও উত্তম। এটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালা অধিক জ্ঞানের জন্যই হজরত আদম (আ)-কে ফেরেশতাগণের সেরা সাব্যস্ত করেছেন। পার্থিব প্রদীপ ফেরেশতাদের থেকে আলো গ্রহণ করে না। বরং সরাসরি তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নূর গ্রহণ করে। অবশ্য কোনো কোনো সময় ফেরেশতাগণ নবী (আ)-গণের নিকট আল্লাহর বার্তা পৌঁছিয়ে থাকেন, এরা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে। মর্তের প্রদীপ স্বর্গীয় আলো থেকে আলোকিত হয়। যদি এক এক বস্তু, এক এক বস্তু থেকে আলোক বা নূর প্রাপ্ত হয়, তা হলে প্রথম উৎসের যে অতি সন্নিকট হবে, তারই মূল্য বেশি। শ্রেণী ও ক্রমানুসারে সেই সর্বোচ্চ আলো।

নিম্নের উদাহরণ থেকে উপরোক্ত বক্তব্য স্পষ্ট ফুটে উঠবে– চাঁদের জ্যোৎস্না জানালা পথে ঘরের দেয়ালে ঝুলানো আয়নায় পরেছে। ঐ

আলোটিই আবার প্রতিবিম্বিত হয়ে সামনের দেয়ালে পতিত হয়েছে এবং তা আবার প্রতিফলিত হয়ে মেঝেতে পরেছে। ফলে মেঝেও আলোকিত হয়েছে। মেঝের আলো দেয়ালের আলোর নিকট ঋণী, দেয়ালের আলো আয়নার আলোর নিকট, আয়নার আলো চাঁদের আলোর নিকট, চাঁদের আলো সূর্যের আলোর নিকট ঋণি। কেননা সূর্য চাঁদের উপর আলো বিকীরণ করে। এখানে নূর বা আলোর চারটি শ্রেণী ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। একটি আরেকটির চেয়েও অধিক মহান ও পূর্ণ। প্রতিটির পৃথক স্থান ও স্তর রয়েছে, যা তারা অতিক্রম করে না।

অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট এ প্রতীতিও জন্মেছে যে, স্বর্গীয় জগতের আলোকও রশ্মিও এমনিভাবে সাজানো হয়েছে এবং সর্বোচ্চ আলোর কাছাকাছি সত্তাই সর্বোত্তম। এ থেকে বলা যায় যে, হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-এর চেয়েও হযরত ইসরাফীল (আ)-এর মর্যাদা বেশি। ফেরেশতাগণের মাঝে তিনিই আলোর মূল উৎস, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অতি সন্নিকটে থাকেন। ফেরেশতাদের মধ্যে নগণ্য মর্যাদার অধিকারীও আছেন। হাশরের ময়দানে তাঁরা বিভিন্ন শ্রেণীতে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁদের মর্যাদা অসংখ্য স্তরে বিভক্ত। তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন–

وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ

وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ -

অর্থাৎ, "আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার জন্য নির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ হয়নি। আমরা শ্রেণীবদ্ধভাবে রয়েছি, এবং আমরা অবশ্যই আল্লাহর প্রশংসাকারী।"

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন স্তরের আলো অসীম নয়। এরা একটি সর্বশেষ উৎসে পৌছে, যে উৎসটি নিজেই নূর বা আলো। অপরের আলোয় যে উদ্ভাসিত নয়। তাঁরই নিকট থেকে সমস্ত আলো ক্রমানুসারে আলো পায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে বস্তুটি অন্য আলো দ্বারা

আলোকিত হয়, সে প্রকৃত আলো আখ্যা পাবার যোগ্য, না যে আলো নিজেই স্বতঃ আলোকিত এবং যে অন্য সবাইকে আলো দান করে? এর উত্তর অতি সহজ। বাস্তবপক্ষে নূর বা আলো নামটি স্বর্গীয় আলোরই প্রাপ্য, যার উপর কোনো আলো নেই এবং যার নিকট থেকে অন্য সব জিনিষের উপর আলো ছড়িয়ে পরে।

গুঢ় রহস্য বা গোপন ভেদ

আমার মতে আদি স্বর্গীয় নূর বা আলো ব্যতীত অন্য সব জিনিষকে আলো বলা উপমা মাত্র। কারণ এদের সবাই অসহায়। এদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সবারই নূর বা আলো অপর সত্তা থেকে ধার করা, অপর স্থান হতে সংগৃহীত। অতএব এদেরকে উপমা হিসাবে আলো বলা যেতে পারে, সত্যিকার অর্থে নয়। এর প্রমাণে বলা যেতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে বস্ত্র, অশ্ব নিজে ধার করে নেয়, তারপর ঐ কাপড় পরে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে জিন কষে ধরে, তাহলে এই ব্যক্তি কি প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বর্যশালী হবে, না উপমাচ্ছলে বলা হবে? একে ঐশ্বর্যশালী বলা কেবল উপমা স্থলেই খাটে। আদতে কিন্তু এ ব্যক্তি পূর্বের মতোই দরিদ্র বলে বিবেচিত হবে। যে ব্যক্তি ধার ফেরত নিতে পারে এবং যার নিকট হতে তা শুরু হয়েছিল, সেই ধার দাতাই হচ্ছেন প্রকৃত ঐশ্বর্যশালী।

আমাদের এখন বুঝতে হবে যে, মূলতঃ আল্লাহ রব্বুল আলামীন-ই হচ্ছেন নূর বা আলো। তাঁর পবিত্র হাতে আলোর সৃষ্টি ও পরিণতি। তিনি সবার পূর্বে আলো দান করেন। এতে অন্য কেউ অংশীদার নেই। তবে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থে যুক্ত আছে। একটি উদাহরণের সাহায্য নিলে কথাটি স্পষ্ট হবে। সম্রাট বা রাজা সামন্ত রাজাদেরকে উপাধি ও তাঁর জায়গীর দান করে থাকেন। সামন্ত রাজা এ কথা সত্য বলে জানেন যে, তাঁর উপাধি ও জায়গীরের প্রকৃত মালিক স্বয়ং সম্রাট, তিনি নন।

অনস্তিত্বের আঁধার হতে অধিক আর কোনো আঁধার নেই। তাই যে আঁধার ছড়িয়ে দেয়, তাঁকে দু' চোখে দেখতে পায় না বলেই

'অন্ধকারাচ্ছন্নকারী' বলা হয়। আসলে তিনি নিজে বিলুপ্ত নন, সুপ্ত নন, জাগ্রত। তার যে সত্তা নিজে বিলুপ্ত, সুপ্ত, অন্যকে অস্তিত্বও দিতে পারে না, তাকে আঁধারই বলা যুক্তিযুক্ত। এ থেকে বুঝা যায়, অবিসংবাদিতভাবে প্রকৃত সত্তা আল্লাহ এবং প্রকৃত নূর বা আলোই হচ্ছেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন।

গুঢ় সত্যের আদি সত্য

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে তত্বজ্ঞানীরা চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সবাই আদি অন্তে ধ্বংসশীল। কোনো বস্তুকে যখন তার স্বকীয় সত্তার বিবেচনা করা হয়, তখন দেখা যাবে যে, এর কোনও অস্তিত্ব নেই। আদি সত্তা হতে অস্তিত্ব সব জিনিষে এসে পৌঁছে। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে একে বিদ্যমান বলা যায়। তবে এক্ষেত্রে যে অস্তিত্বে পৌঁছিয়েছে, তার সাথেই তাকে বিদ্যমান দেখা যাবে তবে এককভাবে নয়। সুতরাং শুধুমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অস্তিত্বই বিদ্যমান।

প্রত্যেক জিনিষের দু'টি দিক রয়েছে। এক দিক তাকে ঘিরে, অন্যদিক আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ নিয়ে। প্রথম দিক দিয়ে তার অস্তিত্ব আছে। তাঁরই সাথে এর অস্তিত্বের সম্পর্ক, যিনি একে অস্তিত্ব দান করেছেন। অতএব আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর অস্তিত্ব নেই। তাঁর অস্তিত্বই একমাত্র অস্তিত্ব। তিনি ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধীরে ধীরে বিলীন হচ্ছে।

তত্বজ্ঞান অনুসন্ধানীগণের হাশরের দিনের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। যেদিন আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলবেন–

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ –

অর্থাৎ, "আজ কার এই আধিপত্য? একমাত্র সর্বজয়ী আল্লাহর।"

কারণ, এ আহ্বান তাঁদের কানে চিরকাল প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। 'আল্লাহু আকবার' দ্বারা তাঁরা মনে করেন না যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যের

তুলনায় বড়। কোনো অস্তিত্ব তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অতিক্রম করাতো দূরের কথা তার অস্তিত্বের সীমানায়ও পৌঁছতে পারে না। আল্লাহর সহিত সম্পর্কের উপরই অন্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে। আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালা নিজ সত্তা থেকে বড় হবেন, ইহা অসম্ভব। তিনি এতো চরম মহান যে তুলনা বা সম্পর্কের দিক দিয়ে তাঁকে মহোত্তম বলা চলে না। নবী বা ফেরেশতাগণ কেউই তাঁর মহত্বের বাস্তব রূপ বুঝতে পারে না। তিনি নিজে নিজেকে যেমন জানেন, বাস্তব জ্ঞানে অন্য কেউ তাঁকে তেমন জানে না। এ দিকটা আমি আমার "কিতাবুল মূফাস্‌সিলাল আসমা ফি মায়ানিল আসমাউল হুসনা" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

তত্বজ্ঞানীগণ উচ্চতর স্থানে পৌঁছে নিজেরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, এক সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। তাঁদের কেউ বৈজ্ঞানিক উপায়ে, কেউ বা আত্মবোধ দ্বারা এ পথে উন্নীত হয়েছেন। তাঁদের অনেকেই পরম একত্বের মাঝে নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলেছেন। নিজেদের বিবেক বুদ্ধি একত্বের অতল গভীরতায় তলীয়েছেন, একত্বের উন্মাদনায় বিভোর হয়েছেন। ঐ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিকির ব্যতীত তাঁদের মধ্যে আর কোনো কিছু ছিলো না; বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে তাঁদের কেউ বা "আমিই সত্য" (اَنَا الْحَقُّ) বলে চিৎকার দিয়ে ওঠেছেন।

কেউ বা "আমি পবিত্র, আমার গৌরব কতো বড়!" سُبْحَانِىْ مَا اَعْظَمُ شَانِىْ - বলেছেন। আবার কেউ "আমার জামার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া কিছু নেই" مَافِى الْجُبَّةِ اِلَّا اللّٰهُ বলেছেন।

আল্লাহ প্রেমিকগণ যখন উন্মাদ ও নেশাগ্রস্ত হয়ে কথা বলেন, তখন নীরব শ্রোতা হওয়া উচিত, তা প্রকাশ করা সমিচিন নয়। উন্মাদনা অপসারিত হয়ে তাঁদের বিবেক ফিরে এলে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, আসলে তাঁরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে একত্রীভূত হননি, একীভুতের এক সাদৃশ অবস্থা লাভ করেছিলেন মাত্র।

একজন আল্লাহপ্রেমিক প্রেমাণুরাগে বলেছেন—

اَنَا مَنْ اَهْوٰى وَمَنْ اَهْوٰى اِنَّا نَحْنُ رُوْحَانِ حَلَلْنَا بَدَنَا ـ

অর্থাৎ, "আমি সেই, যাকে চাই; যাকে চাই সেই আমি। আমরা দু দেহাভ্যন্তরের রাস্তার পথিক।"

যে ব্যক্তি সারা জীবনে আয়না দেখেনি, তাকে হঠাৎ আয়না দেখালে তার মধ্যে নিজের প্রতিমূর্তি দেখে সে মনে করতে পারে যে, আয়নায় প্রতিফলিত ছবি আয়নারই ছবি। একইভাবে কাঁচের গ্লাসে মদ দেখে সে মনে করতে পারে যে, মদের রং গ্লাসের রং। প্রতিদিন এরূপ কল্পনা করলে সে এ চিন্তায় ডুবে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত বলে উঠবে–

رَقَّ الزُّجَاجُ وَرَقَّتِ الْخَمْرُ
وَتَشَابَهَا فَتَشَاكُلُ الْاَمْرُ
فَكَاَنَّمَا خَمْرٌ وَلَاقَدَحٌ
وَكَاَنَّمَا قَدَحٌ وَلَاخَمْرٌ

গ্লাসও সূক্ষ্ম মদও সূক্ষ্ম।
মনে হয় সংঘাতময় কথা হয়েছে–
মদ আছে পেয়ালা নেই;
পেয়ালা আছে মদ নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর প্রেমের উন্মাদনায় বিভোরকে 'নির্বান' বলা হয়। এর চাইতেও ঊর্ধ্বে উঠলে তাকে 'নির্বাণের নির্বাণ' বলা যায়। কারণ, সে তার সত্তা থেকে এবং নির্বাপন হওয়া থেকেও নির্বাণ হয়েছে। এই সময় সে নিজের সম্বন্ধেও ওয়াকিফহাল থাকে না। যদি সে অজ্ঞান অবস্থায় নিজ অবস্থা জানতে পারতো, তা হলে তো জ্ঞানই ফিরতো। এই ধরনের অবস্থাকে রূপক অর্থে 'একীভূত' বলা হয় এবং বাস্তব ভাষায় বলা হয় তাওহীদ। এ সব সত্যের অন্তরালে আরো এমন গুঢ় রহস্য রয়েছে,যার চিন্তা-ভাবনা করা অবৈধ।

সার সংক্ষেপ

আপনারা সম্ভবতঃ সেই দিকটা জানতে চান, যে দিক দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আলো স্বর্গ-মর্তের সাথে সম্বন্ধযুক্ত এবং যে দিক দিয়ে তিনি স্বয়ং আকাশ-পাতালের نُوْر বা আলো। আপনারা অবগত হয়েছেন, তিনিই একমাত্র نُوْر বা আলো। তিনি ভিন্ন অন্য কোনো আলো নেই। তিনি নিজেই আলোকরাশির উৎস। আলোর 'আলো-আঁধারের আলো'। এই আলো নিজে জ্বলে নিজেই জ্বালায়, আপনা হতে আপনার জন্য। এটি কোনো উপাদান হতে সাহায্য নেয় না।

দু'টি মৌলিক আলোক স্তরের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত আলোয় স্বর্গ-মর্ত পরিপূর্ণ। এই দু'টি হলো আমাদের দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি, যা দিয়ে আমরা যথাক্রমে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে বুঝি। যে আলো আমরা আকাশে দেখি; যেমন– চন্দ্র-সূর্য তারকা এবং যা আমরা পৃথিবীতে দেখী; যেমন– সূর্য, কিরণ, যা পৃথিবীর মাঝে ছড়িয়ে পরে। যা বিভিন্ন বর্ণ রং কে বিশেষ করে বসন্তকালকে দর্শনীয় করে তোলে; এবং যে সূর্য-কিরণ পশু-পাখি, বন-জঙ্গল, পথ-ঘাট এক কথায় সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পরে। এসব কিরণ বিনে কোনো রং দেখা যেতো না এবং এদের ধারণা করাও সম্ভব হতো না। এগুলো হলো প্রথম আলোর স্তর 'দৃষ্টির বিবরণ'।

অন্তর্দৃষ্টি মূলতঃ দ্বিতীয় আলোক স্তরে স্বর্গীয় জগত পরিপূর্ণ। ওগুলো ফেরেশতা জাতীয় পদার্থ। নিম্নতর জগতও এসব দিয়ে ভরপুর। অবশ্য এখানে প্রাণীজীবন ও মানবজীবনও বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নতর ব্যক্তিরা আলো দিয়ে নিম্নতর জগতের বিধান চলে। অপর দিক স্বর্গীয় জগতের বিধান ফেরেশতার আলো দিয়ে চলে নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই বুঝানো হয়েছে। যেমন–

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَ كُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا ـ

অর্থাৎ, "সেই আল্লাহ তোমাদের মাটির দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের মাটির পৃথিবীতে আবাদ করেছেন।"

لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِى الْاَرْضِ ـ

অর্থাৎ, "অবশ্যই তাদের তিনি পৃথিবীতে খলীফা মনোনীত করবেন।"

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ـ

অর্থাৎ, "এবং তিনি তোমাদের পৃথিবীর প্রতিনিধি সৃষ্টি করলো।"

اِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ـ

অর্থাৎ, "অবশ্যই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো।"

অনুভূতির বাহ্যিক আলো এবং বুদ্ধির অভ্যন্তরীণ আলোয় পুরো বিশ্বজগত ভরপুর। নিম্ন শ্রেণীর আলোগুলো একে অপরের সাহায্যে প্রজ্বলিত হয়। যেমন প্রদীপ হতে আলো নির্গত হয়। প্রদীপ যেমন তেলের দ্বারা আলো লাভ করে, আল্লাহর নূর বা আলো থেকে তেমনি নবুওয়্যাতের আলো প্রজ্বলিত হয়।

সব আলোই এক আদি আলোর 'আলো'। সব আলোর উৎস ও মূল এক 'লা শারীক আল্লাহ' রাব্বুল আলামীন। তিনিই প্রকৃত 'আলো'। অন্যান্য আলো তাঁর নিকট হতে ধার করা, তাঁর থেকে নির্গত। অতএব তিনিই 'সব'। সব জিনিষের মুখ তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

পাক কালামে মাজীদে বর্ণিত আছে–

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, "যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাবে সে দিকেই আল্লাহ রয়েছেন।"

তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। উপাস্য তাকেই বলা হয়, ইবাদতের সময় সব ছেড়ে যার দিকে মুখ ফিরানো হয়। আর যার অনুসরণ করা হয়। 'তিনি' বলতে তাঁকেই বুঝানো হয় যিনি ব্যতীত অন্য কারো দিকে ইশারা-ইঙ্গিত করা হয় না। যখনই ইশারা করা হবে, প্রকৃতপক্ষে তখন তাঁর দিকে ইশারা করা হবে। যদিও আমরা তাঁর রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকি। উদাহরণঃ বলা যায় যে, কাউকে সূর্যকিরণ বুঝাতে বললে সে সূর্যকে দেখায়।

"আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নেই" (لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ)। সাধারণ লোকের তাওহীদী বাণী এবং "না কিন্তু তিনিই" (لَاهُوَ اِلَّاهُـوَ) বিশেষ লোকের তাওহীদী বাণী। প্রথমটি সাধারণ অর্থবোধক আর দ্বিতীয়টি বিশেষ অর্থবোধক। এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ব্যাপক কথা। এটা যে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, সে চরম একত্বে ডুবে যায়।

এখানে কতগুলো বিষয় লক্ষ্যণীয়–

১. "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিজস্ব কালাম। এর চাইতে অন্য কোনো কালাম উত্তম হতে পারে না। তবে অন্যটিকে উত্তম বলা অলি-আল্লাহগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

২. সাধারণ ও বিশেষ বলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্য পার্থক্য করেছেন। সাধারণ লোকদের জন্য যে নির্দেশ, নবীগণের জন্য সেই একই নির্দেশ নয় কিছু পার্থক্য আছে।

৩. "লা-হুয়া ইল্লাহুয়া" বাক্যটি শরীয়তে সমর্থিত।

চরম একত্বের রাজ্যে আরোহণ মরণশীল মানুষের পরম লক্ষ্য। ঐ মহান বাক্য ব্যতীত এখানে আরোহণ করার অন্য কোনো সোপান নেই। সব কিছু ছেড়ে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিবেদিত প্রাণই উচ্চতর স্থানে পৌঁছতে পারে। সেখানে উত্থান নেই, নেই কোনো পতন। অবতরণকারী নেই, নেই কোনো আরোহণকারী। একত্বের সাথে নেই বহুত্ব। বহুত্ব বিলিন হবার পর গোপনেরও কোনো প্রয়োজন থাকে না। সেইখানে অবস্থার বিবর্তন নেই। তবে হ্যাঁ, উত্থান থেকে পতনের দিকে আগমনেই বিবর্তন ঘটে। কেননা উচ্চতর হতে যদিও আরো উচ্চতর নেই বটে, কিন্তু নিম্নতর তো অবশ্যই আছে। এটিও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের শেষ গন্তব্যস্থল। এই সব যার নিকট পরিচিত তিনিই তা জানেন। যে অজ্ঞ, সে একে অস্বীকার করে। ওলামায়ে রাব্বানী ব্যতীত এ জ্ঞান সম্পর্কে অন্য কারো ধারণা নেই। মূর্খ ব্যক্তি ভিন্ন তাঁদের এ বক্তব্য অন্য কেউই অস্বীকার করে না।

তত্বজ্ঞানীরা বলেন যে, পৃথিবীর আকাশে ফেরেশতা নেমে আসেন; এদের মধ্যে একজন কল্পনায় বিভোর হয়ে একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি আল্লাহর একত্বে ডুব দিয়ে বলছেন, "মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন।" এ অবতরণ ইন্দ্রিয় পরিচালিত।

এই সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ আছে– "আমি বান্দার শ্রবণ শক্তি হয়েছি, যা দ্বারা সে শ্রবণ করে। তার দৃষ্টি শক্তি হয়েছি, যা দ্বারা দর্শন করে এবং তার জিহ্বা হয়েছি, যা দ্বারা সে কথা বলে।"

যদি আল্লাহ বান্দার শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি হন, তাহলে একমাত্র তিনিই শ্রোতা, দর্শক ও কথক। এ দিকেই আরেকটি হাদীস ইঙ্গিত বহন করে যা হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছে।

"আমি পীড়িত ছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি.... ।"

তাওহীদী রাজ্যের সাতটি ধাপ রয়েছে। এর পর বুদ্ধি একত্বের আরশে উপবেশন করে। যেখান হতে আকাশের সর্বস্তরে নির্দেশ দেয়। অধিকাংশ ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ আদমকে আপন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। কেউ "আনাল হক" (اَنَا الْحَقُّ) বলেন, কেউ "আমি পবিত্র" বলেন। আল্লাহ বলেন– "আমি পীড়িত ছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি।" "আমি তার চোখ, কান, জিহ্বা হয়েছি।" গভীরভাবে চিন্তা করলে এ সবের ভিন্ন মর্মার্থ রয়েছে।

এই গুঢ় আলোচনা দীর্ঘ করলে আপনারা তা বুঝতে পারবেন না। এ সব হচ্ছে জটিল আলোচনা। বোধগম্য নয়, দুর্বোধ্য, কারণ মানুষের বুদ্ধি সীমিত। তাই আপনাদের বুঝার জন্য নীচে সহজভাবে বিষয়টির অবতারণা করা হলো–

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –

অর্থাৎ, "আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আলো।"

(সূরা আন নূর আয়াত নং ৩৫)

আয়াতটি পার্থিব দৃষ্টি গোচরীভূত আলোর সাথে তুলনা করে বুঝা যেতে পারে। যেমন– বসন্তের আগমনে গাছে গাছে নতুন নতুন পাতা

গজায় আর ঘটে পাতায় পাতায় সবুজ রংয়ের সমাহার। তখন মনে হয় রং ভিন্ন আর কিছু নেই। এই সময় কোনো কোনো দর্শক তো মনে করে যে, আলোর কোন অস্তিত্ব নেই। রং ভিন্ন রংয়ে আর কিছু নেই। কিন্তু কি করে আলোকে অস্বীকার করা যায়? কারণ এর মাধ্যমে আমরা সব জিনিষ দেখি। আলো নিজে অক্ষিগোচর হয় ও অন্য জিনিষকে দর্শায়। সূর্যাস্তের সময়, প্রদীপ নিবে যাবার সময় এবং ছায়া তিরোহিত হবার সময় দর্শন অন্তর্নিহিত ছায়া ও আলোর মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে, তা স্বীকার করে। তখন বাধ্য হয়ে সে বলে যে রং ছাড়াই আলোর আলাদা অস্তিত্ব আছে। রংয়ের মাধ্যমে তাকে অনুভব করা যায়।

অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বহু জিনিষ দেখেন, তার সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেও দেখেন। কেউ কেউ এদের থেকে একধাপ সামনে অগ্রসর হয়ে বলেন– "আমি প্রথমে আল্লাহকে না দেখে অন্য কোন জিনিষ দেখতে পাই না।"

এদের কেউ কেউ আবার আল্লাহর সাথে অন্য কিছুও দেখেন। আবার কেউ প্রথমে কিছু দেখেন; অতঃপর কিছুর সাথে আল্লাহকেও দেখেন।

প্রথমোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে এ আয়াতে কারীমাটি রয়েছে–

اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ –

অর্থাৎ "তোমার প্রভু সব জিনিষের সাক্ষীর জন্য কি যথেষ্ট নন?"

শেষোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে এ আয়াতে কারীমা রয়েছে যে,

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ –

অর্থাৎ, "শীগগীরই আমি তাদের আমার নিদর্শনাবলী দিগন্ত বলয়ে ও তাদের অন্তঃকরণে দেখিয়ে দিবো।"

প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তির আল্লাহর প্রত্যক্ষ সঙ্গা আছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তির। তাঁর কাজ থেকেই তাঁকে ধারণা করে। প্রথম আল্লাহর বন্ধুদের স্থান। দ্বিতীয় দৃঢ় বুদ্ধিমানদের। এ দুই শ্রেণী ভিন্ন আর সবই গাফিল ও উদাসীন!

এখন আপনারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, আলোর জন্য প্রতিটি জিনিষ প্রত্যক্ষ গোচর হয়। আবার অন্তর্চক্ষুর নিকট যখন জিনিষ সুস্পষ্টরূপে ভেসে উঠে, তখন আল্লাহর সাহায্যেই তা ভেষে উঠে। অতএব, তিনি সবার সাথে সংযুক্ত রয়েছেন, বিমুক্ত নন। তাঁর নিকট থেকেই সব প্রকাশিত হয়। তবে এতদুভয়ের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়, আলোর অপসারণে আঁধার, আঁধারের তিরোধানে আলোর অবির্ভাব। কিন্তু ঐশি আলো নিভে না, কখনো অস্তমিত হয় না। এটি সব জিনিষের সাথে বিরাজমান।

যদি আল্লাহর অন্তর্ধান সম্ভব হতো, তাহলে আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-মর্ত সবকিছু ধ্বংস হয়ে একাকার হয়ে যেতো। বস্তু সব সময় একই আকারে দেখা দেয়। কারণ এর সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সব জিনিষই সব সময় সর্বকালের জন্য তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করে। এতে সৃষ্টির পার্থক্য দূর হয় এবং চলার পথ গোপন থাকে। প্রতিটি জিনিষকে তার বিপরীত জিনিষ থেকে জানা যায়। যার বিপরীত নেই, বিরুদ্ধ কিছু নেই; তাকে জানা বড় কঠিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেকে অধিক প্রকাশ করার কারণে সৃষ্টি থেকে গুপ্ত রয়েছেন। তাঁর আলোর তীব্রতার জন্যই তিনি সব দৃষ্টি শক্তির বাইরে রয়েছেন। তিনি মহান, তিনি পবিত্র।

আমার এ আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে যে, মহান আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালা কোনো জিনিষের সাথে আবদ্ধ নন, বরং তিনি সব জিনিষের সাথে রয়েছেন। স্থানের সাথে তাঁর সম্বন্ধ নেই; বরং তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি প্রতিটি জিনিষের সত্তায় আছেন এবং প্রতিটি জিনিষকে সবার গোচরীভূত করছেন।

তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে প্রকাশকারী সত্তা প্রকাশিত জিনিষ থেকে দূরে থাকতে পারেন না। এ কারণেই বলা হয়, তিনি সর্ব বস্তুর সাথে আছেন। যাদের এই সব বুঝার ক্ষমতা ও সহনশীলতা নেই, তাদের এ পথ পরিত্যাগ করাই উত্তম। কারণ, প্রত্যেক জ্ঞানের জন্য বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। যে বিষয়ের জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে বিষয়ই তার জন্য সহজ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মিশকাত, মিসবাহ, যুজাজাহ ইত্যাদির ব্যাখ্যা

আলোচনার সুবিধার্থে দ্বিতীয় অধ্যায়কে দু'টি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। এ দু'টি বিষয় বিবেচনা ও আলোচনার ক্ষেত্র সীমাহীন, আমরা এখানে সংক্ষেপে ইঙ্গিত দিব।

এ উপমার রহস্য কি? অর্থকে উপমা হিসেবে বর্ণনা করার কারণ কি? ইন্দ্রিয় জগত ও স্বর্ঘীয় জগতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি? এবং তুলনা মূলক বৈশিষ্ট্যের যথার্থতা কি? প্রভৃতি প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়-বস্তু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মানবিক রূহ এবং তার ক্রমোন্নতির স্তর সম্পর্কে বর্ণনা বা আলোচনা রয়েছে। আমরা পূর্বোক্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা করার জন্যই পরবর্তী উপমা জগতের আলোচনা করে থাকি। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর বর্ণনা–

مَثَلُ نُوْرِهٖ فِىْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا -

অর্থাৎ, মু'মিনের অন্তঃকরণে আল্লাহর নূরের উদাহরণ এরূপ, যেমন তার অন্তঃকরণে প্রদীপ।"

কিরাআতে এবং হজরত উবাই ইবনে কাব (রা) এর–

مَثَلُ نُوْرِقَلْبِ مَنْ اٰمَنَ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا -

অর্থাৎ, "মু'মিনের অন্তঃকরণের নূরের উদাহরণ প্রদীপের ন্যায়।"

কির'আতে মুমিনের অন্তঃকরণের আলোর উল্লেখ রয়েছে।

—৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপমা ও উপমা নীতির গুঢ় রহস্য

জগৎ দু'প্রকার। যেমন–

১. স্বর্গীয় (ঊর্ধ্ব জগত)।

২. ইন্দ্রিয় (নিম্ন জগত)।

এ দু'টোকে অনুভূতি ও প্রজ্ঞাভিত্তিকও বলা যায়। এই সব শব্দ প্রায়ই সমার্থবোধক। তবে ইবারত যা পৃথক। যদি এদের সত্তা হিসেবে ধরা হয়, তাহলে ইন্দ্রিয় ও স্বর্গীয় হবে। যদি চাক্ষুস হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে প্রজ্ঞা ও অনুভূতি ভিত্তিক হবে। আর যদি একে অপরের তুলনা করা হয় তবে উচ্চতর ও নিম্নতর হবে। কখনো এটার একটিকে দৃশ্যমান মর্ত জগত এবং অন্যটিকে অদৃশ্যমান স্বর্গীয় জগতও বলা হয়। এর শব্দমালার দিকে লক্ষ্য করলে ঘাবড়ে যাবার উপক্রম হবে। তত্বানুসন্ধানীগণ এর অর্থকে প্রধান ও শব্দাবলীকে অপ্রধান মনে করেন। কিন্তু দূর্বল ব্যক্তিরা এর বিপরীত। তারা শব্দ দ্বারা রহস্যোদঘাটন করতে ব্যর্থ চেষ্টা করে। এ দু'টি দলের প্রতি আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালা নিমোক্ত আয়াতের ইঙ্গিত দিচ্ছেন–

أَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖ أَهْدٰى أَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

অর্থাৎ, "যে মুখ নীচু করে চলে, সে কি অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত, না যে সোজা-সরল পথে চলে?"

দু'জগতের অর্থ উপলব্ধি হবার পর এটাও জানা দরকার যে স্বর্গীয় ও উচ্চতর জগতকে অদৃশ্য জগত বলা হয়। কেননা, বহু ব্যক্তির নিকট এটি অদৃশ্য ও অবোধগম্য। ইন্দ্রিয় জগতকে দৃশ্যমান জগত বলা হয়। কেননা, সব লোকের কাছে এটি বোধগম্য।

ইন্দ্রিয় জগত হচ্ছে বুদ্ধি জগতের সিঁড়ি। ইন্দ্রিয় জগত থেকে মানুষ বুদ্ধি

জগতে আরোহণ করে। এ দু'জগতের মধ্যে যোগাযোগ আছে। তা না হলে এ জগতে আরোহণের পথ রুদ্ধ হতো। তাহলে আল্লাহর নৈকট্য লাভও অসম্ভব হতো। কেউই আল্লাহর সন্নিকটে পৌঁছতে পারতো না, যতক্ষণ না সে পবিত্র জগতের বড় বড় পথ অতিক্রম করতো! ইন্দ্রিয় ও কল্পনা ছাড়িয়ে উচ্চতর জগতকে পবিত্র বলা হয়। যে জগত থেকে কেউ বাহিরে বেরোয় না এবং কোনো অপরিচিত জন ভেতরে প্রবেশ করে না। 'হাযীরাতুল কুদস' (পবিত্র জগত) অর্থাৎ জান্নাত বলা হয়। অধিকাংশ সময় আমরা পবিত্র আলোয় স্নাত মানুষের আত্মিক শক্তিকে 'ওয়াদিল মুকাদ্দাস' (পবিত্র উপত্যকা) বলে থাকি। হাযীরাত শব্দটি আরো বহু স্তরকে টেনে আনে। এ সব শব্দ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট প্রহেলিকা বা অবোধগম্য নয়। এখন এই শব্দমালার ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা আমাদের আলোচনা থেকে দূরে সড়ে পরবো। অতএব আসুন এবার আমরা শব্দার্থ রেখে মূল আলোচনার দিকে ফিরে আসি।

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, ইন্দ্রিয় জগত হচ্ছে স্বর্গীয় জগতের সিঁড়ি। এ উর্ধগতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সরল, ঋজু পথে চলা। একে ধর্ম বা হিদায়াতের মাঞ্জিল বলা হয়। দুই জগতের মধ্যে যদি কোনো সম্বন্ধ না থাকতো, তাহলে এক জগত হতে অন্য জগতের দিকে আরোহণ করার প্রয়োজন হতো না। আল্লাহর দয়ায় ইন্দ্রিয় জগতকে স্বর্গীয় জগতের বিপরীত হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণেই এ জড় জগতের এমন কোনো বস্তু নেই যা স্বর্গীয় জগতের কোন কিছুর উপমা বা প্রতিক নয়। কোন সময় এখানকার একটি বস্তুই স্বর্গীয় জগতের কয়েকটি বস্তুর উপমা হতে পারে। আবার কখনো স্বর্গীয় জগতের একটি বস্তু এ দৃশ্যমান জগতের অনেক বস্তুর উপমা হতে পারে। দু'য়ের মধ্যে কোনো না কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হলেই উপমা হয়। উপমার সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এই কাজ মানুষের সাধ্যের বাইরে। মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবন এ কাজের জন্য যথেষ্ট নয়।

আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে চাই। ফলে অল্প হতে বহু প্রমাণ গড়ে উঠতে পারে। এভাবে আপনাদের সামনে রহস্য উপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত হবে।

স্বর্গীয় জগতের জ্যোতিষ্ক পদার্থকে মালাইকা বলে। ঐ পদার্থ থেকে মানবিক রূহের উপর আলো বিচ্ছুরিত হয়। এ জন্য তাদেরকে 'রব্ব' বলা হয়। এ দিক দিয়ে আল্লাহ হচ্ছেন 'রব্বুল আরবাব'।

আলো বিকিরণ পথে বিভিন্ন স্তর আছে। দৃশ্যমান জগতে জ্যোতিষ্ক আলোর উপমা হচ্ছে চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রে। এ পথের পথিক প্রথমে নক্ষত্রের স্তরে পৌঁছে, তখন তার ওপর আলোর ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়। সে এই অতুলনীয় সৌন্দর্য অবলোকন করে চিৎকার করে বলে ওঠে– هٰذَا رَبِّىْ "এই আমার প্রতিপালক।" অতঃপর ঐ যাত্রী সামনে অগ্রসর হয়ে চাঁদ দেখতে পান। তখন সে পূর্বের অস্তমিত নক্ষত্রকে একটি কল্পনা মাত্র মনে করে এবং বলে উঠে, لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ "আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না।"

পরিশেষে, ঐ যাত্রী আরো সামনে অগ্রসর হতে থাকে এবং এমন একস্থানে পৌঁছে, যাকে সূর্যের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, এখানে সে দেখে যে, তার যাত্রাপথে সুর্য সব চাইতে বিরাট। জ্যোতিষ্ক পদার্থের মধ্যে তা বৃহত্তর। পূর্বের চাঁদ-নক্ষত্রের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, এটিও অস্ত যায়।

অসম্পূর্ণতা ও অস্ত যাবার সাথে এ সম্বন্ধ আছে। অতএব সে মনে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলে–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ –

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আমি সুদৃঢ়ভাবে আমার মুখমণ্ডল তাঁরই দিকে ফিরালাম যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই।"

الذى বা "যিনি" একটি ফাঁকা কথা। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, এমন কি প্রতীক আছে, যা 'যিনি'র সাথে উপমা দেয়া যেতে পারে? এর কোনো উত্তর দেয়া যায় না। কারণ, আদি একক সত্তা আল্লাহ সব সম্বন্ধের উর্ধ্বে।

একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– "আল্লাহর উপমা কি?"

একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– "আল্লাহর উপমা কি?"

এর জবাবে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থাৎ, "(আপনি) বলুন, তিনিই এক আল্লাহ। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননা এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"

এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি সব উপমার উর্ধ্বে, অতুলনীয়। এই কারণেই যখন ফিরাউন হজরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলো–

وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, "বিশ্ব প্রভূ কি?"

সে সময় হজরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কার্য সম্বন্ধেই জবাব দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন–

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

অর্থাৎ, "যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের প্রভূ।"

এরূপ উত্তর শুনে ফিরাউন তার পরিষদদের বললো–

اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ـ

অর্থাৎ, "তোমরা কি লক্ষ্য করলে?"

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কিন্তু আল্লাহর আসল উপমার বর্ণনা এড়িয়ে গেলেন।

সে সময় হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন–

رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ـ

অর্থাৎ, "তিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রভূ।"

এখানে ফিরাউন আল্লাহর উপমা জানতে চেয়েছিলো, কিন্তু হজরত মূসা আলাইহিস সালাম বারবার আল্লাহর কার্যাবলী সম্বন্ধে জবাব দিতেছিলেন। ফলে ফিরাউন মূসাকে উন্মাদ বলতে বাধ্য হলো এবং বললো–

إِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ـ

অর্থাৎ, "তোমাদের নিকট যে রাসূল পাঠানো হয়েছে, তিনি অবশ্যই বদ্ধ উন্মাদ।"

স্বপ্নের তাবীরের দ্বারা উপমা

স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়্যাতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ। তাই স্বপ্নের তাবীরের মাধ্যমে উপমা দেয়া যেতে পারে। যেমন–

১. স্বপ্নে সূর্য দর্শনের তা'বীর হলো রাজ-দর্শন। এ দু'য়ের অন্তর্নিহিত অর্থে সামঞ্জস্যশীল। তা ছাড়া এ দু'টোই সবার উর্ধ্বে এবং এর আলোয় সবাই আলোকিত হচ্ছে।

২. স্বপ্নে চাঁদ-দর্শনের তা'বীর হলো উযীর হওয়া। কেননা সূর্যাস্তের পর সূর্যালোক চাঁদের মাধ্যমেই পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পরে। যেমন– রাজার অনুদান উযীরের মাধ্যমেই বহু দূরের ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে থাকে।

৩. যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, তার নিকট সীলমোহর আছে, যা দিয়ে সে লোকের মুখমণ্ডলে এবং স্ত্রীর যৌনাঙ্গে মোহরাঙ্কি করছে; তাহলে এর তা'বীর হবে রমযান মাসে সুবহি সাদিকের আগে আযান দেয়।

৪. যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, সে জলপাই গাছে জলপাই তেল ঢালছে। তাহলে এর তা'বীর হবে সে যে দাসীকে বিবাহ করছে সে তার মা অথচ সে তাকে চিনে না।

সব ধরণের তা'বীর দিয়ে এভাবে উপমা পেশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সেজন্য স্বর্গীয় জগতের আত্মিক বিষয়ের কতিপয় চন্দ্র-সূর্য তারকা দ্বারা উপমা দেয়া হলো। বাকীগুলোকে অন্যান্য উদাহরণ দিয়ে উপলব্ধি করা যেতে পারে–

ক. আত্মিক জগতের কোনো বস্ত যদি স্থির, অপরিবর্তনীয়, বিরাট, মহান হয়, যা থেকে জ্ঞানের ঝরণা সজোরে হৃদয়ে উৎসারিত হয়, তার উপমা তূর পর্বত হতে পারে।

খ. সেখানে যদি এমন কোনো মহত্ত্বের অধিকারী বস্তু থাকে, যার একটি অপরটি হতে উত্তম, তহলে তার উপমা হবে ডানের উপত্যকা।

গ. মহৎ গুণ মানব হৃদয়ে পৌঁছে এক কলব হতে অন্য কলব স্থানান্তরিত হলে উপমা হবে বামের উপত্যকা।

ঘ. اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا অর্থাৎ, "আমি রূহকে আমার নির্দেশ দিয়ে আপনার নিকট পাঠিয়েছি।" এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, নবীর রূহ প্রত্যাদেশে আলোক উদ্ভাসিত। অতএব ঐ জ্বালানের মূলের উপমা হবে অগ্নি।

ঙ. নবীগণের নিকট থেকে প্রজ্ঞাবানদের মধ্যে যারা লোক পরম্পরা শ্রুত বর্ণনা মেনে চলে, তাদের আগুনের মশালের সাথে উপমা দেয়া যায়।

চ. যারা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন যাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও নবীগণের বুদ্ধি পাওয়া যায়, তাদের আগুনের উত্তাপের সাথে উপমা দেয়া যেতে পারে। কারণ, আগুনের সম্বন্ধ শুনে উত্তাপ পাওয়া যায় না। এর নিকট গেলে উত্তাপ পাওয়া যায়।

ছ. যদি নবীগণের প্রথম জামায়াত ইন্দ্রিয় ও কল্পনার অধীনতা হতে পবিত্র জগতের দিকে উন্নীত হয়, তবে তার উপমা

হচ্ছে পবিত্র উপত্যকা। দো-জাহানকে পরিত্যাগ করা ছাড়া এবং এক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত পবিত্র উপত্যকা অতিক্রম করা অসম্ভব।

দুনিয়া ও আখিরাত একে অপরের বিপরীত। কখনো ঐ দু'টোকে বর্জন করা আবার কখনো অর্জন করা সম্ভব। হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা, কা'বার দিকে ফেরার সময় জুতো খোলা হচ্ছে বর্জন করার উপমা! আমরা আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালার দরবারে অগ্রসর হয়ে বলছি যে, যদি এই দরবারে এমন কিছু থাকে, যার দ্বারা বিভিন্ন বিজ্ঞান হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত হয়, তাহলে তার উপমা হচ্ছে 'কলম'।

যদি এদের মধ্যে এমন বস্তু হয়, যা অঙ্কিত জ্ঞানের সাথে মিলিত হতে পারে, তা হলে তাদের উপমা হলো 'ফলক' গ্রন্থ এবং উজ্জ্বল সহীফা।

যদি বিজ্ঞানের নক্শার চাইতে অধিক কোনো বস্তু থাকে, যা তাকে কাজ করতে বাধ্য করে, তবে তার উপমা হচ্ছে হাত।

যদি হাত, ফলক, কলম ও গ্রন্থ বিজড়িত দরবারের কোনো নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা থাকে, তবে তার উদাহরণ হচ্ছে আকৃতি, রূপ।

যদি মনুষ্য আকৃতি এর অনুকরণে নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা অনুসারে গঠিত হয়, তাহলে এর ঐ ধরনের আকৃতি হবে রাহমানের আকৃতি অনুসারে। রাহমানের আকৃতি অনুসারে এবং আল্লাহর আকৃতি অনুসারে কথা দু'টোর মধ্যে যথেষ্ট বৈপরিত্য রয়েছে। ইলাহীর আকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত রহমতে ইলাহী ঐ আকৃতির সাথেই বিজড়িত।

আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালাম-এর প্রতি এটি প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে সারাজাহানের সর্ব প্রকার সংক্ষিপ্ত আকৃতি দান করেন। এক কথায় বলা যায়, আদম হলেন এক সংক্ষিপ্ত পৃথিবীর নমুনা। আদমের আকৃতি আল্লাহর আকৃতির লিপিতে লিপিবদ্ধ হয়েছিলো। অবশ্য তা আক্ষরিক ছিলোনা। কেননা, তার লেখা হরফের উর্ধ্বে। তাঁর এ দয়া না হলে আদম-সন্তান তাদের প্রভূকে জানতে পারতো না। যে নিজেকে চিনেছে, সে প্রভূকে চিনেছে। রহমতের ঐ রূপ মর্মার্থ হওয়ায় আদম রহমানের আকৃতিতে সৃষ্ট হয়েছেন, আল্লাহর আকৃতিতে নন!

ইলাহী, রহমান, মালিক, রব্ব এক নয়। এ জন্যই তিনি তাঁদের সবার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেন–

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ اِلٰهِ النَّاسِ ـ

অর্থাৎ, "(আপনি) বলুন, আমি মানব জাতির প্রভু, মানবজাতির অধিপতি, মানবজাতির ইলাহীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

এরূপ অর্থ না হলে "আল্লাহ তায়ালা আদমকে রহমানের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।"

ছহীহ্ হাদীসটি অভিধানিক অর্থে ঠিক হতো না, বরং "আল্লাহ আদমকে নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।" বলা ঠিক হতো।

'মালিক'কে 'রব্ব' থেকে পৃথক করার জন্য বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। আমি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এ টুকুই আপনাদের জন্য যথেষ্ট। এ বিষয়টি একটি অকুল সাগর। কুল কিনারা পাওয়া দুষ্কর। উপরিউক্ত আলোচনার উপর যদি আপনাদের কোনো সংশয় থাকে, তাহলে আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালার নিম্নোক্ত কালামের প্রতি লক্ষ্য করুন–

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ـ

অর্থাৎ, "তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর নিজ নিজ পরিমাণ মতো নদী-নালা রয়েছে।"

সার সংক্ষেপ

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত উপমা দিয়ে আপনারা মনে করবেন না যে আমি আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বর্জন করেছি এবং আপনারাও ঐ অর্থকে বাতিল বলে মেনে নেবেন। আমি এটা বলতে পারিনা যে, হজরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট জুতো ছিলো না এবং আল্লাহর বাণী– فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ অর্থাৎ, "জুতা খোলো"। তিনি শুনেন নি।

বাহ্যিককে অস্বীকার করা বাতিলপন্থীদের ধর্ম, যারা শুধু একটা দিক অর্থাৎ জগতের সমন্বয় সাধন সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না, এরূপ রহস্যকে পুরোপুরি অস্বিকার করা হলো জড়বাদীদের মত। অন্য কথায়, যে ব্যক্তি শুধু বাহ্যিক– কেই বিশ্বাস করে, সেই হলো অধ্যাত্মবাদী এবং যে ব্যক্তি এ দু' অবস্থাকে যোগ করতে পারে, সেই হলো কামিল।

এ কারণেই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআন মাজীদের যাহির-বাতিন, আদি-অন্ত অর্থ রয়েছে। এই হাদীস শরীফটি হজরত আলী (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে।

আমি মনে করি যে, 'জুতো খোলো' এই নির্দেশটি হজরত মূসা আলাইহিস সালাম আক্ষরিকভাবে জুতো খুলে পালন করেছিলেন আর উভয় জগতের সাথে সম্বন্ধ ছিন্ন করে অধ্যাত্মিকভাবে পালন করেছিলেন। এ দু'য়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। একটি হতে আর একটিতে অতিক্রম করা মানে বাহ্যজগত হতে অন্তর্জগতে প্রবেশ করা।

(ইহা একটি অভিনব গুপ্ত ব্যাখ্যা। অধ্যাত্মিক পথের পথিকগণই এর মর্মবুঝতে পারবেন। অন্যরা সহজে এর মর্মোদ্ধার করতে পারবে না।)

এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী শুনলেন, "যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে, সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।" তবু সেই ব্যক্তি কুকুর ঘরে রাখলেন এবং বললেন, এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ নেয়া যাবে না, বরং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর প্রকৃত অর্থ হলো, অন্তরের ঘরকে রাগের কুকুর থেকে পরিষ্কার কর। কেননা, এটি ফেরেশতাদের আলোর পথে বাধা জন্মায়।

অন্য একজন প্রথমতঃ এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে অনুসারে এ নির্দেশ পালন করে, অতঃপর বলে যে, কুকুর তার আকৃতির জন্য কুকুর নয়, বরং বাতিনী দিক দিয়ে সে হিংস্র। যদি ঐ ঘরকে যা মানুষের দেহের বাসস্থান, বাহ্যিক কুকুর থেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজন হয়, তাহলে মানুষের হৃদয় মনকে যা তার আসল সত্তার আল্লাহর বাসস্থান, অধ্যাত্মিকভাবে কুকুরের হিংস্রতা থেকে মুক্ত রাখার আরো অধিক প্রয়োজন।

যে ব্যক্তি যাহির-বাতিন উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে, সেই ইনসান-এ কামিল! কামিল ঐ ব্যক্তি, যার জ্ঞানের আলোক তার ভক্তির আলোককে (নূরকে) নিবার না। এ জন্যই পূর্ণ আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও কামিল ব্যক্তি শরীয়তের সামান্য আদেশ-নিষেধকেও অবজ্ঞা করে না।

১. কোনো কোনো তরীকতপন্থী ব্যক্তি শরীয়তের বহ্যিক নিয়মাবলীকে গালি– চার মতো ভাঁজ করে রাখে, এটা তাদের মারাত্মক ভুল।

২. তাদের কেউ কেউ সালাত পড়া ছেড়ে দেয় এবং বলে যে, 'আমরা তো সর্বদাই বাতিনী সালাত পড়ছি।

৩. তাদের মধ্যে আবার কেউ বলে, 'আমাদের কাজ-কর্মে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কোনোই প্রয়োজন নেই।'

৪. কেউ বলে, 'মানুষের মন পাপে ভরে থাকে তাই তাকে পবিত্র রাখা কখনও সম্ভব নয় এবং কাম ক্রোধের মূলোচ্ছেদ করারও প্রয়োজন নেই। এর কারণ, সে বিশ্বাস করে যে ঐগুলো ত্যাগ করার জন্য সে আদিষ্ট হয়নি। এই সব হচ্ছে মূর্খতা ও পদস্খলন। শয়তান তাকে আত্মম্ভরিতার রশিতে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছে।

চলূন এবার আমরা জুতোর ব্যাখ্যার দিকে যাই। জুতো খুলো মানে উভয় জাহানের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা। প্রত্যেকটি বাহ্যিক জিনিষের সাথে এক আভ্যন্তরীণ সত্যের যোগাযোগ আছে। যারা এ সত্য উপলব্ধি

করতে পেরেছেন, তাদের আত্মা 'শিশার' স্তরে পৌঁছেছে। যে কল্পনা উপমার উপাদান যোগায়, তা শক্ত, স্থূল, তা রহস্যকে লুকিয়ে রাখে। এটি মানুষ ও আলোর মধ্যে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এটি পরিষ্কার হলে শিশার ন্যায় হয়। তখন তা আলোর মধ্যে আবরণ হয়ে দাঁড়ায় না।! বরং এটি আলো পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। আর পরে এই আলোকে বাতাসের দ্বারা নির্বাপিত হওয়া হতে রক্ষা করে।

কল্পনার স্থূল নিম্নজগত নবীদের নিকট শিশা, আলোর জন্য ক্ষুদ্র তাক, রহস্যের জন্য মুকুর এবং উচ্চতর জগতের জন্য সিঁড়ি স্বরূপ। এটা থেকে বুঝা যায় যে, প্রকাশ্য উপমা ঠিক। এর পশ্চাতে আছে গুপ্ত রহস্য।

নবীগণের দৃষ্টিশক্তি

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলেছেন, "আমি আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-কে হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখছি।"

এক্ষণে আপনারা এ ধারণা করবেন না যে, তিনি স্বচক্ষে তাঁকে দেখেন নি। জাগ্রত অবস্থায় তিনি এটি দেখেছিলেন যেমন একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পায়। যদিও ঐ সময় আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) নিজ বাসগৃহে নিদ্রায় থাকেন। ঘুম ও অনুরূপ অবস্থার মধ্যে এরূপ স্বপ্ন দর্শন হয়, কারণ আত্মার উপর ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার প্রভাব তখন থাকে না। ইন্দ্রিয় আত্মাকে ব্যস্ত করে রাখে, তাকে ইন্দ্রিয় জগতে টেনে আনে এবং তার সত্তাকে অদৃশ্য এবং স্বর্গীয় জগত হতে ফিরিয়ে আনে। কোনো কোনো নবুওয়্যাতী আলো এতো উজ্জ্বল হয় যে, ইন্দ্রিয় তাকে নিজের রাজ্যের দিকে আকর্ষণ করে না। কাজেই আলো যা স্বপ্নে দেখে, সে তা জাগ্রত অবস্থায়ই দেখতে পায়। যখন তিনি চরম পূর্ণতায় পৌছে তখন সে অদৃশ্য আকার দেখার পথে সীমাবদ্ধ অবস্থায় থাকবে না বরং এখান থেকে বর্তমান নিম্নতর জগতের দিকে টানবে। যদি জগত প্রভাবের দিকের আকর্ষণকারী অন্য আকর্ষণকারীর তুলনায় অত্যাধিক শক্তিশালী হয়, তা

হলে আত্মা জান্নাতের পথ হতে প্রত্যাবর্তন করবে। যদি বিশ্বাসের আকর্ষণ অধিক শক্তি সম্পন্ন হয়, তাহলে ইহা সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে। অথবা তার ভ্রমণ পথ জান্নাতের দিকে এগিয়ে চলে। দৃশ্যমান জগতে এর উদাহরণ হচ্ছে মেঘ। অনুরূপ নবীদের রহস্য ধারণার পূর্বেই প্রকাশিত হয়। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রায় আবদুর রহমানের বেলায়ই সীমাবদ্ধ নয়। যদিও তখন তিনি শুধু তাঁকেই দেখেছিলেন। যার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রবল এবং বিশ্বাস দৃঢ়, এ তার ক্ষেত্রেও সত্য। অবশ্য তার বেশি ধন-সম্পদ থাকতে হবে। কারণ, অধিক সম্পদ বিশ্বাসকে কোনঠাসা করতে চায়। কিন্তু বিশ্বাসের জন্য তা পেরে ওঠে না।

এ আলোচনা থেকে বুঝা যাবে যে নবীগণ স্থূল জিনিষকে কিভাবে দেখতেন এবং স্থূল বস্তু ব্যতীত কিভাবে মর্মোদ্ধার করতেন। অধিকাংশ সময় প্রথম ভাবকে তাদের দৃষ্টির নিকট উপস্থাপিত করা হয়। এরপর সেখান থেকে তাঁরা ঐ ভাবকে কল্পনার শক্তিতে ফেলেন এবং ভাবানুযায়ী কিছু স্থূল বিষয়ের ছাপ গ্রহণ করেন। জেগে থাকা অবস্থায় ওহীর ঐ বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যেমন ঘুমের স্বপ্নে তা'বীরের প্রয়োজন। যদি ঘুমে ও সব অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তা নবুওয়্যাতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগের সমান হবে আর যদি জাগ্রত অবস্থায় হয়, তবে তার মর্যাদা আরো অনেক বেশি। আমার মতে জাগ্রত স্বপ্নের অংশ তিন ভাগের এক ভাগ। কারণ, নবুওয়্যাতের বৈশিষ্ট্য তিন শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এদের মধ্যে জাগ্রত স্বপ্ন একটি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলোকোজ্জাল মানব আত্মার বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা

১. **ইন্দ্রিয়মূলক আত্মা ঃ** এটি ইন্দ্রিয় কর্তৃক আনীত সংবাদ গ্রহণ করে। এটা হচ্ছে জীবাত্মার মূল। দুধের শিশুর মধ্যে এটা দৃষ্ট হয়।

২. **কল্পনামূলক আত্মা ঃ** ইন্দ্রিয় কর্তৃক আনীত সংবাদকে এ আত্মা লিখে রাখে এবং নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখে। প্রয়োজনবোধে প্রজ্ঞামূলক আত্মার নিকট পেশ করে। দুধের শিশুর বিকাশের প্রথম দিকে এ ভাব তার মধ্যে পাওয়া যায় না। এ জন্য শিশু যখন কোনো জিনিষকে দেখে, তখন সে তা পেতে চায়। কিন্তু তা যখন তার দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, তখন সে তা ভুলে যায় এবং তা পাবার জন্য মন তার আকুলি-বিকুলি করে না। যখন ক্রমে ক্রমে সে বড় হতে থাকে, তখন সে এর জন্য কান্নাকাটি আরম্ভ করে এবং তা পেতে চায়। কারণ, এর ছবি তার কল্পনায় সুরক্ষিত হয়। কারো কারো এ শক্তি আছে আর কারো কারো এ শক্তি নেই। পতঙ্গের মধ্যে এ শক্তি নেই, সে আগুনে পুড়ে মরে। দিনের সূর্যালোকের প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগ, তাই সে আগুনে ঝাঁপিয়ে পরে। সে মনে করে যে, প্রদীপ সূর্য কিরণের একটি প্রশস্ত জানালা; কাজেই ক্ষিপ্ততার সাথে সে আগুনের দিকে ধাবিত হয় এবং কষ্ট পায়। যদি সে আগুন অতিক্রম করে আঁধারে যায়, তাহলে আবার আলোর দিকে বার বার ফিরে আসে। যদি পূর্বের ব্যথা তার স্মৃতিতে জাগ্রত থাকতো, তাহলে সে আর আগুনের দিক ফিরে আসতো না। অন্যদিকে কুকুরকে একবার লাঠি দ্বারা আঘাত করলে পরের বার লাঠি দেখেই দ্রুত পালাবে।

৩. **প্রজ্ঞামূলক আত্মা ঃ** এটি হচ্ছে ইন্দ্রিয় ও কল্পনা এড়িয়ে ভাব বুঝার আত্মা। এটি মনুষ্য সুলভ গুণ। এটি পশু ও শিশুদের মধ্যে দেখা যায় না। এর ধারণা অবশ্যম্ভাবী ও বিশ্বজনীন। যেখানে বুদ্ধির আলোকে চোখের দৃষ্টি শক্তির উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, সেখানে এ বিষয় উল্লেখিত হয়েছে।

৪. **চিন্তামূলক আত্মা ঃ** এটা শুধু প্রজ্ঞাভিত্তিক বিষয়াদি গ্রহণ করে তাদের একত্র করে এবং পারস্পরিক আত্মিক পরিচিতি সৃষ্টি করে। যদি এতে দু'টো ফল বের হয়ে আসে, তবে আবার তাদের একত্র করে এবং সঠিক ফল বের করে এবং তা থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৫. **নবুওয়্যাতমূলক আত্মা ঃ** এটা নবী ও কতিপয় অলীর সাথে জড়িত। অদৃশ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, পরকালীন বিধানাবলী এবং স্বর্গ মর্ত্যে সব জ্ঞান তাঁদের নিকট প্রকটিত হয়। অবশ্য তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার আত্মা কোনো কোনো খোদায়ী জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝতে পারে না। নিম্নের আয়াতে কারীমা এদিকেই ইঙ্গিত করেছে–

وَكَذَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِ نَا وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ –

"এমনিভাবে আমি আপনার কাছে আমার নির্দেশ-সহ রূহ পাঠিয়েছি। নতুবা আপনি জানতেন না যে কিতাব ও ঈমান কি। কিন্তু আমি ঐগুলো আলো করেছি, যা দিয়ে আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে সৎপথ প্রদর্শন করি এবং অবশ্যই আপনি সোজা পথ প্রদর্শন করেন।"

বুদ্ধির উপর আরো একটি স্তর থাকা অসম্ভব নয়, যার উপর এমন বস্তু প্রকট হয়, যা বুদ্ধির স্তরে প্রকাশ পায় না। চরম পূর্ণতা সবাই বুঝতে পারে না। এটা কোনো, কোনো মানুষের বৈশিষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। একদল ব্যক্তি কবিতায় পারদর্শী। অপর দিকে অনেকেই কবিতার ছন্দ, গতি, মর্ম, লয় ভাব দ্যোতনা সম্পর্ক একেবারে অজ্ঞ। কোনো কোনো লোক সূন্দর সুর মুর্ছনা, গীতি কাব্য গান রচনা করতে পারে। তারা এ সবের একচেটিয়া অধিকারী। তারা এ সব মিউজিক

সৃষ্টি করে মানুষের মনে হাসি-কান্নার সান্তনা উন্মাদনা আনন্দ-উচ্ছাসের উদ্রেক করতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি এ সবের প্রতি ঝোঁক ও প্রবণতা নেই, সে সুর শুনে সত্যি কিন্তু এ সবে তার মনে মাদকতা সৃষ্টি করে না। গানে মাতোওয়ারা ও সুরে উন্মাদ ব্যক্তিকে দেখে সে হাসে আর বিস্ময় বোধ করে। এ পথের সব বিশেষজ্ঞগণ তাকে রাগিণীর তত্ত্বজ্ঞান বুঝালেও সে বুঝবে না। আপনাদের উপলব্ধির জন্য এটা সাধারণ উদাহরণ। আপনিও নবুওয়ত মূলক আত্মার শামিল হয়ে যান। ওলীগণকে এর অনেকটা দেয়া হয়েছে। আপনি নিজে উপরিউক্ত উপমা অনুধাবন করুন এবং জ্ঞানীদের দলভূক্ত হবার চেষ্টা করুন। এ যোগ্যত অর্জন করতে না পারলে কমপক্ষে ঈমান আনুন। কেননা–

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ -

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন।"

জ্ঞান ঈমানের চাইতে এবং গূঢ় রহস্যের অভিজ্ঞতা জ্ঞানের অভিজ্ঞতার চাইতে বড়। যুক্তি-প্রমাণের নাম জ্ঞান এবং পিতৃ-পুরুষের ন্যায় শুধু মেনে চলা ও গূঢ় রহস্যের অধিকারীর প্রতি উত্তম মনোভাব পোষণ করার নামই ঈমান।

উল্লিখিত পাঁচটি মানবিক আত্মাই হচ্ছে আলো। এদের সাহায্যেই সব ধরণের অস্তিত্বশীল বস্তু প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও কল্পনা প্রসূত বস্তু যদিও পশু-পাখির মধ্যে পাওয়া যায় তবুও এর উন্নত অংশ মানুষের মধ্যেও পাওয়া যায়। মানুষের জন্য এটা আদর্শের বিশেষ ধারণা নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পশু-পাখির জন্যও সৃষ্টি করা হয়েছে জীবিকা অন্বেষণের মানসে। মানুষের অনুগত থাকার ঐ দু'টো পশুর নিমিত্ত সৃষ্টি হয়েছে। ঐ দু'টোর উপর মানুষ সওয়ার হয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। সে একজন নির্দিষ্ট লোককে চিনতে পারলে সাধারণভাবে বুদ্ধি দিয়ে সবাইকে চিনতে ও জানতে পারে। অর্থাৎ বিশ্বজনীন ভাব বোধগম্য করতে পারে। এ বিষয়ে আমরা হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি।

আয়াতের উপমা

মানুষের পঞ্চশক্তিতে তাক, কাঁচ, প্রদীপ, বৃক্ষ, তেল এই পাঁচটি বস্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু এখানে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাবো।

১. **ইন্দ্রিয় শক্তি ঃ** যদি আপনারা ইন্দ্রিয় শক্তির দিকে দৃষ্টি দেন তাহলে দু'চোখ, দু'কান, দু'নাক, থেকে এর আলো আসে বলে মনে করবেন। অভিজ্ঞতার জগতে এর উপযুক্ত উপমা হচ্ছে 'তাক'।

২. **কল্পনা শক্তি ঃ** কল্পনা শক্তির তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন–

ক. বস্তু জগতের সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এর জন্য পরিমাণ, আকার-গঠন ও নির্দিষ্ট দিক রয়েছে। ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তির তুলনায় দূর নিকট হয়ে থাকে। দৈহিক গুণ বিশিষ্ট স্থুল জিনিষগুলো খাঁটি বুদ্ধির আলোর নিকট অস্পষ্ট।

খ. এই স্থুল জিনিষগুলো পরিষ্কার, স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম, মজবুত হলে বুদ্ধির ভাবের সাথে সাদৃশ্য লাভ করে এবং উহার নিকট হতে আগত আলোর কাছে স্বচ্ছ হবে।

গ. কল্পনা প্রাথমিক পর্যায়ে চরম মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এতে সে বুদ্ধিগত জ্ঞান সংরক্ষণ করতে পারে, যার ফলে ঐ জ্ঞান বিশৃংখল হতে পারে না। বরং কল্পনালব্ধ জ্ঞানকে এক সাথে রক্ষা করে।

দৃশ্যমান জগতের দর্শকের মাঝে আপনারা উপরিউক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পান। এটি কাঁচ ব্যতীত অন্য কোথাও কোন খানে পাওয়া যায় না। কেননা, কাঁচ যদিও স্থুল, তা সত্বেও এটি স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম। ফলে এটি প্রদীপের আলোকে পর্দা করে রাখে না; বাইরে বের করে দেয়। এটি প্রবল বাতাস ও অত্যন্ত ঝাঁকানী থেকে আলোকে রক্ষা করে।

৩. **বুদ্ধিশক্তি ঃ** এর দ্বারা ঐশী ভাবমূলক জ্ঞান লাভ করা হয়। উপমার কারণ আপনাদের জানা আছে। পূর্বে নবীগণের প্রদীপ উজ্জ্বল আলোচনায় এ বিষয়টি জেনেছেন।

৪. **চিন্তাশক্তি ঃ** এর বিশেষত্ব এই যে, একটি শিকড় থেকে শুরু করে দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়। অতঃপর প্রতিটি শাখা হতে দু'টি করে প্রশাখা বের হয়। এমনিভাবে অনেক শাখা-প্রশাখা প্রসারিত হয়ে একটি নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছে। অতঃপর ইহা সমগোত্রীয়দের বেলায় মধ্যস্থতার কাজ করে। আমাদের পৃথিবীতে এর উপমা হচ্ছে, 'গাছ'। যখন এর জ্ঞানের ফলাফল দ্বিগুণ ও স্থিতিশীল, তখন এর উপমা জলপাই গাছ ব্যতীত নাশপাতি, সেব, ডালিম প্রভৃতি অন্য কোনো গাছ দ্বারা দেয়া ঠিক হবে না। কারণ, জলপাই ফলের মূল হচ্ছে তেল, যা দিয়ে প্রদীপ জ্বলে। সব ধরনের তেলের চাইতে এ তেল অত্যন্ত প্রোজ্জ্বল। এ গাছে অসংখ্য ফল ধরে। তাই একে 'বরকতময় বৃক্ষ' বলা হয়। খাঁটি বুদ্ধিগত চিন্তার শাখা-প্রশাখা, দিক ও দুরত্বের সম্বন্ধে নেই। তাই একে 'পূর্বমুখীও নয়, পশ্চিম মুখি নয়' বলা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

৫. **নবুওয়্যাতী পবিত্র শক্তি ঃ** এটি প্রোজ্জ্বল ও স্বচ্ছ শর্ত সাপেক্ষে ওলীদেরও শক্তি। চিন্তাশক্তি, তালিম ও বাইরের সতর্কবাণীর সাথে এটি সম্বন্ধযুক্ত। এর এক অংশ পূর্ণ পরিষ্কার। মনে হয় যেনো এটি অন্যের সাহায্য ব্যতিত নিজেই জ্বলে। এ দিক দিয়ে 'পরিষ্কার' ও 'স্বচ্ছ' দ্বারা।

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ـ

'এর তেল স্বতঃ জ্বলে, যদিও তা আগুন স্পর্শ করেনি' বলা হয়েছে। কোনো কোনো অলি এমনও আছেন, যাঁদের আলো নবীগণের সাহায্য ছাড়াই উজ্জ্বলভাবে জ্বলে। আবার কোনো কোনো নবীদের আলো ফেরেশতাদের সাহায্য ছাড়াই জ্বলে ওঠে।

মানবাত্মার আলোগুলো স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। প্রথম প্রকার হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের আলো। এটি কল্পনার ভিত্তি ও ভূমিকা। কেননা, ইন্দ্রিয় ব্যতীত কল্পনা করা অসম্ভব। এরপর চিন্তা ও বুদ্ধির আলোর স্থান। এ দিয়ে বুঝা যায় যে, কাঁচ প্রদীপের মত এবং তাক কাঁচের মতো হয়েছে। এ সব আলোর একের চাইতে অন্যটি শীর্ষস্থানীয় হলে তাকে– نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ অর্থাৎ, "আলোর উপর আলো" বলা যেতে পারে।

সার সংক্ষেপ

বিশ্বাসী, নবী এবং অলিগণের অন্তঃকরণের বেলায় এ উপমা দেয়া চলে। কাফেরদের বেলায় এটি খাটে না। কারণ, আলো কথাটি সৎপথে চলাকেই বুঝায়।

যে ব্যক্তি সৎপথ থেকে বিভ্রান্ত হবে, সে বাতিল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। শুধু তাই নয় সে আঁধারের চাইতেও আঁধার। আঁধার না সত্য পথে চালাতে পারে, না সৎ পথে চালাতে পারে। কাফেরদের জ্ঞান-বুদ্ধি অন্ধ সম। তাদের বোধশক্তি তাদেরকে ভ্রান্ত পথে চলতে সাহায্য করে। এদের উপমা হচ্ছে–

كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ـ

"গভীর সাগরে আঁধারে নিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায়, যাকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে ঢেকে ফেলে, তার উপরে মেঘমালা ছেয়ে আছে।"

ঢেউ তোলা সাগর হচ্ছে পৃথিবী। ভীষণ বিপদ সঙ্কুল, দুঃখ দুর্যোগপূর্ণ, বিবর্তনে ভরা এ পৃথিবী। এটি মানুষকে অন্ধ করে দেয়।

প্রথম ঢেউ হলো মোহ-কামের ঢেউ, যা আত্মার পশুত্ব ভাবকে উত্তেজিত করে। আর ইন্দ্রিয় স্বাদ ও পার্থিব আলো আকাংখা পূর্ণ করার জন্য তাকে মাতিয়ে রাখে। এ সব লোক চতুষ্পদ পশুর মতো পানাহার করা আর দুনিয়ার আরাম আয়েশ ভোগ করে। জাহান্নাম এদের ঠিকানা অতএব, অবশ্য এই ঢেউ অন্ধকার হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় ঢেউ হচ্ছে হিংস্রবৃত্তির ঢেউ। এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে রাগ বা ক্রোধ, শত্রুতা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, কৃপণতা, গর্ব ও ধনাধিক্যের দিকে উত্তেজিত করে। এ ঢেউ অবশ্যই আঁধার হবে। ক্রোধ হচ্ছে বুদ্ধির শত্রু। ইহা সর্বোচ্চ ঢেউ, কেননা, অধিকাংশ সময় দেখা গেছে, যে; ক্রোধের ঢেউ উঠলে ইহা কামের চাইতেও বেশি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। তখন মানুষ কামনা, লালসার কথা বেমালূম ভুলে যায়। কামনা-লালসা ক্রোধকে দমাতে পারে না।

মেঘ হলো অসৎ বিশ্বাস, কুচিন্তা ও মিথ্যা ধারণা। এটি ঈমান, মারেফাতে হও ও কুরআন মাজীদ হতে আলো অর্জন করার পথের পর্দা। কেননা, মেঘের ধর্ম হলো সূর্য কিরণকে ঢেকে রাখা। সর্ব প্রকার আঁধার ছেয়েছে বলে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ -

"আঁধারের উপর আঁধার পুঞ্জিভুত।"

এ আঁধারও আল্লাহ তায়ালাকে নিকটস্থ জিনিষের জ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। দূরবর্তী জিনিষের জ্ঞানের তো কথাই নেই। এ কারণে কাফেররা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিস্ময়কর মু'জিযা উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছে। অথচ, এটি সামান্য চিন্তা করলেও বুঝা যায়।

এ কারণেই পাক কালামে মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَهَا -

অর্থাৎ, "যখন সে নিজের হাত বের করে, তখন তা-ও দেখতে পায় না।"

সব আলোর মূল উৎস আল্লাহ তায়ালা। অতএব প্রত্যেক একত্ববাদীর এ বিশ্বাস করা বাঞ্ছনীয়–

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ نُوْرًا فَمَالَهُ مِنْ نُوْرٍ -

অর্থাৎ, "আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না, তার জন্য কোনো আলো নেই।"

এই আয়াতের এতটুকু রহস্য বর্ণনা করাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করছি।

তৃতীয় অধ্যায়

সত্তর হাজার পর্দার গুঢ় ব্যাখ্যা

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "আল্লাহর আলো আঁধারের সত্তর হাজার পর্দা আছে। যদি তিনি ঐগুলো অপসারণ করতেন তবে তাঁর মহান আলোকরাশি প্রতিটি দর্শককে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করতো।"

কোনো কেনো বর্ণনায় সত্তর হাজার পর্দা আবার কোনো কোনো বর্ণনায় সাতশোর কথাও উল্লেখ আছে।

আমি এখন বলছি যে, আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালা নিজের সত্তার জন্য নিজেই প্রোজ্জ্বল। পর্দা তো গোপনীয়তার জন্য ব্যবহৃত হয়। পর্দাকৃত লোক তিনভাগে বিভক্ত ঃ—

১. যারা শুধু আঁধারের পর্দায় রয়েছেন।

২. যারা শুধু আলোর পর্দায় রয়েছেন।

৩. যারা আলো এবং আধারের পর্দায় রয়েছেন।

এ তিনটি বিভাগের অসংখ্য শাখা-উপশাখা রয়েছে। এগুলোর আমি সংখ্যা গণনা করার চেষ্টা করবো। তবে আমি একথা দৃঢ়ভাবে বলতে পারিনা যে, এই সংখ্যাগুলোই মূল উদ্দেশ্য, না এর দ্বারা সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্যে। সাতশো বা সত্তর হাজার নির্ধারিত করা সম্পর্কে নবুওয়্যাতী শক্তিই বুঝতে পারে। তবে আমার ধারণা এই যে, এখানে উল্লেখিত সংখ্যা দিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো হয়নি। অবশ্য সংখ্যা বর্ণনা করা মানুষের নিয়ম-নীতি। এ দিয়ে আধিক্যই বুঝানো হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো হয় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত। আমি আমার সাধ্য মতো এই তিনটি বিভাগ ও তার শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে বর্ণনা করার প্রয়াস পাবো।

প্রথম শ্রেণী

যারা আঁধারের মধ্যে আবৃত, তারাই প্রথম প্রকারের বলে গণ্য। এরা আল্লাহ তায়ালার অবিশ্বাসী নাস্তিক। এ সকল ব্যক্তিগণ আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে না। এরা পরজীবনের চাইতে ইহজীবনকে প্রাধান্য দেয়।

এর উদাহরণে আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালা বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ, "তারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবন পছন্দ করে।"

এরা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন–

ক. যারা এই পৃথিবী সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। কিন্তু তাদের প্রকৃতি একে অসম্ভব বলে মনে করে। অথচ প্রকৃতি এমন একটি গুণ যা জড় পদার্থের মধ্যে স্থিতিশীল। এটি নিজেই আঁধার। কারণ, এতে না আছে অনুভূতি না আছে নিজের সত্তা সম্পর্কে চেতনা এবং না আছে এর ধারণাশক্তি। এর জন্য আলোও নেই, যা বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখতে পায়।

খ. যারা নিজেদের চিন্তায় মগ্ন থাকে। তারা কার্য কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে না। তাদের সত্তা ও লোভ লালসাই হচ্ছে তাদের জন্য পর্দা। কুপ্রবৃত্তির মোহ হতে বেশী আঁধার আর কিছু নেই। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ -

অর্থাৎ, "আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন যে, আপন প্রকৃতিকে ইলাহী বলে গ্রহণ করেছে?"

এ কারণেই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে সব কল্পিত মাবুদের উপাসনা করা হয়, তাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সব চাইতে অধিক নিকৃষ্ট হচ্ছে কুপ্রবৃত্তির লোভ-লালসা।" এটিও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যেমন–

১. এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা মনে করে যে, পৃথিবীর চরম পাওয়া হচ্ছে নিজের অভাব পুরণ করা; পশুপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ

করা অর্থাৎ বিয়ে-সাদী ও পানাহার করা এবং সুন্দর সুন্দর বহুমূল্যবান পোষাকাদী পরিধান করা। এরা স্বাদ-আহলাদের দাস, তাই তার পূজারী। তারই অনুসন্ধানে নিমগ্ন থাকে। এসব হস্তগত করাকে সৌভাগ্য বলে তারাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। যারা নিজেদের জন্য এগুলো পছন্দ করেন তারা ইতর প্রাণীর সমান। শুধু তা-ই নয় এর চেয়েও অধম। এর চেয়ে আর কি গহীন আঁধার আছে! তারা শুধু নিবিড় আঁধারে নিমজ্জিত।

২. অন্য আরেক শ্রেণীর ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, তারা প্রতিষ্ঠা 'জয়' এবং, শ্রেষ্ঠত্ব চায়। এই জন্য তারা হত্যা, লুটতরাজে সদা লিপ্ত থাকে, এটি বেদুইন, জংলী এবং অধিকাংশ নির্বোধদের মতামত। এরা হিংস্রতার আঁধারে নিমজ্জিত। হিংস্রতার মধ্যে ডুবে থাকাই তাদের ধর্ম।

৩. এক শ্রেণীর ব্যক্তি চায় যে, তাদের অত্যধিক ধন-সম্পদ, অর্থ বৈভব হোক। তারা মনে করে যে, আশা-আকাঙ্খা অভাব-অভিযোগ, মনের খায়েশ পূর্ণ করার উৎকৃষ্ট হাতিয়ার হচ্ছে ঐশ্বর্য। সম্পদ পূঞ্জিভূত করা এবং তা বৃদ্ধি করাই হচ্ছে তাদের মূলমন্ত্র। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও ভাল ঘোড়া, চতুস্পদ জানোয়ার ক্ষেত-খামার বাড়ানোই হচ্ছে তাদের দিন রাতের একমাত্র সাধনা। অতঃপর তারা মাটির নীচে মুদ্রা বা ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখে সঞ্চয়ের পাহাড় গড়ে তোলে। আপনারা অবশ্য দেখবেন যে, তারা সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে। বিপদ সঙ্কুল ময়দান অতিক্রম করে। নানাস্থানে ঘুরে ফিরে বহু কষ্ট ভোগ করে। অকুল সাগরে পাড়ি জমায় আর অর্থ সংগ্রহে লিপ্ত থাকে অথচ নিজের জন্য তা খরচ করে না কৃপণতা করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে বলেছেন, "স্বর্ণের দাস অর্থের দাস ধ্বংস হোক।"

স্বর্ণ, রৌপ্য যে দুইটি ধাতব পদার্থ মাটির মতই আর একটি সৃষ্টি, একথাটি মানুষ বুঝতে চায় না। এর চাইতে

আর কি আঁধার হতে পারে! যদি তা দিয়ে অভাব ও প্রয়োজন মেটানো না যায় এবং প্রয়োজনে তা ব্যয় করা না যায়, তাহলে তা পাথর বই আর কি হতে পারে!

৪. আরেক শ্রেণীর বোকা আরো চরমে উঠেছে। তারা মনে করে যে, যশঃ মান, প্রতিপত্তিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য। খ্যাতি, সম্মান ও ঘরে ঘরে তাদের নামের চর্চা হোক তারা চায়। তাদের অনেক হুকুমের দাম হোক, শাসনের লাগাম তাদের হাতে আসুক এটাই তারা সর্বান্তকরণে কামনা করে।

আপনারা তাদের লক্ষ্য করবেন যে, তারা সদাসর্বদা আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকে আর নিজেদের প্রশংসা করে। তাদের কারো কারো গৃহে খাবারের বন্দোবস্ত পর্যন্ত নেই। অপরে যেনো ঘৃণার চোখে না দেখে, তাই তারা দামী দামী পোশাক-পরিচ্ছদে বহু অর্থ ব্যয় করে। তারা সংখ্যায় অনেক। তারা সবাই আল্লাহর পক্ষ হতে উদাসিন ও আঁধারের পর্দায় আবৃত রয়েছে। তাদের আত্মা অন্ধ হয়ে গেছে। এ রকমারী ব্যক্তিদের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে, যারা মুখে– لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" স্বীকার করে। সম্ভবতঃ মুসলমানদের ভয়ের কারণে তারা এটি মুখে বলে। অথবা তাদের অর্থ-অনুগ্রহ পাবার আশায় তারা ঐ কলেমা মুখে বলে! তারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মের পক্ষপাতিত্বের জন্য এরূপ গোঁড়ামী করে। যদি তারা এ কালেমা দ্বারা সৎকর্মের দিকে অগ্রসর না হয়, তাহলে এটা তাদেরকে আঁধার থেকে আলোর পথে আনতে পরবে না। তাদের বন্ধু মরদুদ শয়তান তাদের আলো থেকে বের করে আঁধারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আবার যদি এই ঈমানের সৌজন্যে তারা খারাপ কাজকে খারাপ এবং সৎ কাজকে ভালো মনে করে তাহলে তারা পাপী হলেও একেবারেই অধাঁরে নেই।

দ্বিতীয় শ্রেণী

যারা আলো আঁধারের পর্দায় রয়েছে, তারা দ্বিতীয় প্রকারের। এরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। আর তা হচ্ছে–

১. যাদের আঁধারের মূল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে।

২. যাদের আঁধারের মূল কল্পনার মধ্যে।

৩. যাদের আঁধারের মূল ফাসিদ বুদ্ধি ভিত্তিক কিয়াসের মধ্যে। পর্যায়ক্রমে এদের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হলো–

ক. যাদের আঁধারের মূল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, তাদের মধ্যে এমন লোক নেই, যে নিজের সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং লোভ-লালসা থেকে বাঁচতে না পারে, আল্লাহর জ্ঞানের জন্য আকাংখা না করে। তাদের মধ্যে প্রথম স্তরে পরে মূর্তি পুজারীরা এবং দ্বিতীয় স্তরে দৈত্যবাদীরা। এ দু'টোরও কয়েকটি স্তর আছে ঃ

প্রথম স্তর।

মূর্তি পূজারীদের। তারা সাধারণতঃ জানে যে, তাদের একজন দেবতা আছে, যে নিজেকে তাদের আধারময় সত্তার উপরে স্থান দেয়। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের দেবতা অন্য সবার চাইতে অধিক প্রতাপশালী এবং উত্তম জিনিষের চেয়েও অতি উত্তম। কিন্তু ইন্দ্রিয় তাদের এমনভাবে আবৃত করে রেখেছে যে, তারা ইন্দ্রিয় জগত থেকে সামনে অগ্রসর হয় না। তারা মূল্যবান খনিজ পদার্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং মণিমুক্তা দ্বারা সুন্দর মূর্তি তৈরি করে এবং তাদেরকে দেবতা বলে বিশ্বাস করে। তারা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর মধ্যে তাঁর সৌন্দর্য ও গৌরবের আলোয় আবৃত। কিন্তু আধার ঐ আলোকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে।

দ্বিতীয় স্তর

এরা হচ্ছে দূরবর্তী এক স্থানের একদল ব্যক্তি। তাদের কোনো মাযহাব (দল) ও শরীয়ত নেই। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের একজন অত্যন্ত সুন্দর দেবতা আছে। তাই তারা কোনো অসাধারণ ও পরম সুন্দর ব্যক্তি, বৃক্ষ, অশ্ব প্রভৃতি দেখলে তাকেই দেবতা মনে করে সিজদা করে। তারা বলে, এ আমাদের দেবতা। তারা আল্লাহ সৌন্দুর্যের আলোয় উদ্ভাসিত এবং সাথে সাথে ইন্দ্রয়ের আঁধারে মিশ্রিত। তারা মূর্তি পূজারীদের চাইতে আলোর রাজ্যে বেশ কিছুটা প্রবেশ করেছে। তারা ব্যক্তি বিশেষের নয়, সাধারণ সৌন্দর্যের উপাসনা করে। তারা প্রকৃতির হাতে গড়া সৌন্দর্যের পূজা করে, নিজেদের হাতে গড়া কৃত্রিম সৌন্দর্যের নয়।

তৃতীয় স্তর

এরূপ ব্যক্তিরা বলে যে, আমাদের দেবতা তাঁর আদি সত্তায় আলো। তিনি সৌন্দর্যের দিক দিয়ে মহান সৌন্দর্যশালী, নিজের সত্তার ব্যাপারে লুকায়িত বা গোপন এবং নিজের উপস্থিতিতে রুদ্র। তাঁর কাছে পৌঁছার কারো সাধ্য নেই। তাদের মতে যা অবোধগম্য, তা অর্থহীন। তারা উপরোক্ত বৈশিষ্ট আগুনের মধ্যে পেয়েছে বলে তারা আগুনের পূজা করে এবং নিজেদের দেবতা বলে জ্ঞান করে। তারা প্রভূত্ব ও গৌরবের আলোতে আচ্ছাদিত। এ সব আল্লাহর আলোর অন্তর্গত।

চতুর্থ স্তর

এরূপ ব্যক্তিরা মনে করে যে, আমাদের অগ্নির উপর অধিকার আছে। এটি ইচ্ছামতো জ্বালাতে-নিভাতে পারি। এই কারণেই তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। তারা

বিশ্বাস করে যে, যে বস্তুতে প্রভূত্ব ও সৌন্দর্য পাওয়া যায়, আমাদের উপর যার একচ্ছত্র প্রভাব আছে এবং যা উন্নত, উচ্চ, সেই আল্লাহ। এই ব্যক্তিদের মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুপ্রবেশ করেছে। তাদের কেউ কেউ ধ্রুবতারা আবার কেউ কেউ জুপিটারের পূজা করে। কেউ কেউ গ্রহ-নক্ষত্রেরও পূজা করে থাকে। তারা উচ্চ, উজ্জ্বল, বিজয়, আল্লাহর এই তিন আলো দ্বারা আবৃত। এ সবও আল্লাহর আলোয় অন্তর্ভূক্ত।

পঞ্চম স্তর

এরূপ ব্যক্তিরা বলে যে, আলো সূর্যের একচেটিয়া অধিকার নয়। কারণ অন্যান্য নক্ষত্রদেরও নিজস্ব আলো আছে। যেহেতু আলোর ব্যাপারে আল্লাহর অংশীদার নেই, সেহেতু তারা পরম আলোকেই পূজা করে। তারা মনে করে যে, এ আলোই বিশ্বপ্রভু এবং সব সৌন্দর্য তাঁরাই। ঐ সব লোকেরা যখন বুঝে যে, অন্যান্য অমঙ্গলকর জিনিষের অস্তিত্ব এ দুনিয়াতে আছে, এর পরেও তারা কোনোভাবেই ঐগুলোকে নিজেদের দেবতার উপর আরোপ করতে পারে না। তারা পৃথিবীকে আলো ও আঁধারের হাতে সোপর্দ করে। তাই তারা এ দু'টোকে 'ইয়াযদান' ও 'আহরমান' বলে অভিহিত করে। এরা হলো দৈত্যবাদী সম্প্রদায়।

খ. যাদের আঁধারের মূল কল্পনার মধ্যে। এ শ্রেণীর ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় অতিক্রম করেছে। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জিনিষ ভিন্নও আরো কিছুর অস্তিত্ব আছে, যা কল্পনাকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই তারা এমন এক সত্তার পূজা করে, যে সিংহাসনে বসে থাকে। এদের নিম্নতম স্তরে দেহবাদীরা রয়েছে। অতঃপর এই সিংহাসন-বাদীরা অসংখ্য দলে

বিভক্ত রয়েছে। এদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে আমি অবগত নয়। তবে তাদের মধ্যে উচুস্তরের এমন লোক আছেন, যারা আল্লাহ তায়ালাকে দেহধারী মনে করেন না। তাদের মধ্যে এমন ধারণাও রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা স্থানের সাথে সংযুক্ত রয়েছেন।

গ. যাদের আঁধারের মূল ফাষিদ চুক্তিভিত্তিক কিয়াসের মধ্যে। তারা এমন এক উপাস্যের পূজা করে যে, শ্রোতা, দ্রষ্টা, জ্ঞানী, শক্তিশালী, জীবিত ও দিক-মুক্ত। তারা ঐ গুণাবলিকে নিজেদের ন্যায় মনে করে। এমন কি তাদের কেউ কেউ বলে যে, "তাঁর কথা আমাদের কথার ন্যায় শব্দ ও অক্ষরে প্রকাশিত হয়।" অনেকে আবার এর চেয়েও বেশী অগ্রসর হয়ে বলে– "না, বরং তাঁর কথা আমাদের অন্তরে চিন্তার ন্যায় অক্ষর ও শব্দহীন।"

যখন তাদেরকে আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন ও জীবনের মর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন তারা এমন কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করে, যা আল্লাহর উপর মানবীয় গুণ আরোপ ব্যতীত আর কিছু নয় যদিও বাহ্যত তারা এরূপ স্বীকার করে না। এ শব্দগুলো আল্লাহতে আরোপ করার প্রকৃত তাৎপর্য তারা বুঝে না। তাই তারা ইচ্ছা সম্পর্কে বলে যে, তাঁর ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার ন্যায় নতুন পুরোনো নয়। আল্লাহ আমাদের ন্যায় ইচ্ছা করে ও দাবী করে। এটা একটি প্রসিদ্ধ মাযহাব। এসমস্ত ব্যক্তি কোনো কোনো আলোতে আবৃত থাকা সত্ত্বেও ফাসিদ বুদ্ধির কিয়াসের আধারে নিমজ্জিত।

তৃতীয় শ্রেণী

যারা শুধু আলোর পর্দায় রয়েছে, তারা তৃতীয় প্রকারের! তারা অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। আমি এদের মাত্র তিনটি শ্রেণীরই আলোচনা করবো।

১. যারা আল্লাহর গুণাবলীর সত্য অর্থ জ্ঞাত হয়েছেন। তারা বুঝেছেন যে কালাম, ইচ্ছা, শক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি আল্লাহর গুণাবলীকে এভাবে অভিহিত করা হয় না, যেভাবে মানুষের ক্ষেত্রে হয়। তাঁরা ঐ গুণাবলী দিয়ে আল্লাহকে বুঝাতে, বুঝতে রাজী নন।

   সাধারণভাবে তাঁরা সৃষ্টির বর্ণনা দিয়ে আল্লাহকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। যেমন, ফিরাউন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন করলো, "বিশ্বপ্রভূ কী?" হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কার্যাবলী সম্বন্ধে জবাব দিলেন, "তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের প্রভূ।"

২. এদের অবস্থা আরো উন্নত। এরা বুঝেছেন যে আকাশ অসংখ্য এবং প্রত্যেক আকাশের ভিন্ন ভিন্ন করে একজন গতিদাতা ফেরেশতা রয়েছেন। তারাও সংখ্যায় অসংখ্য। ইন্দ্রিয়ের আলোর সাথে তারার যে সম্পর্ক, আল্লাহর আলোর সাথে তাদেরও সেই সম্পর্ক। তাঁরা আরো বুঝতে পেরেছেন যে, এই আকাশ অন্য আকাশের অধীনে রয়েছে। এই সকল আকাশ দিনরাত ঐ আকাশের অধীনে আবর্তিত হয়। উপরিউক্ত মহাপ্রভূ আকাশগুলোকে বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি এর গতিকে পরিচালিত করছেন। এ কারণে তাঁরা বলে থাকে যে, আল্লাহ তায়ালার বেলায় 'বহুত্ব' খাটে না।

৩. এরা আরো ঊর্ধ্বে অবস্থান করছেন। তাঁরা বলেন যে, বস্তুর গতিদান হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার একটি খেদমত। বিশ্ব প্রভূর খেদমত ও ইবাদত তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে একজন

ফেরেশতা বান্দা দ্বারাই প্রতিপালিত হয়। ইন্দ্রিয়ের আলোর সাথে চাঁদের যে সম্পর্ক আল্লাহর সাথে চাঁদের যে সম্পর্ক আল্লাহর পবিত্র আলোর সাথে এই মালাইকাও সেই সম্পর্ক। তাঁরা মনে করেন যে, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছে এই গতি দানকারী ফেরেশতার মাননীয়। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন তার মান্য করার যোগ্য। আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য আদেশের মাধ্যমে গতি সৃষ্টি করেছেন কাজের মাধ্যমে করেননি।

আমি উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমার বক্তব্য বা চিন্তাধারা তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। তবে আধ্যাত্মিক রুচিহীন ব্যক্তি এ মর্ম সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না বলেই আমার মনে হয়।

এ সব স্তর শুধু আলো দ্বারা আবৃত। এতে আঁধার নেই।

যারা অক্লান্ত সাধনার বলে এখানে পৌঁছতে পারে, তাঁরা কৃতকার্য হন এবং তাঁদের নিয়ে একচতুর্থ শ্রেণী গঠিত হয়। তাঁদের নিকট বিষয়টি খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে, এই মান্যবর مُطَاعٌ আল্লাহ খাঁটি একত্বগুণের সাথে গুণান্বিত। তাঁর বাস্তব অস্তিত্বের সাথে এমনই সম্বন্ধ, যেমন সূর্যের সাথে আলোর বা আগুনের সাথে স্ফুলিঙ্গের সম্পর্ক। অতঃপর তাঁরা এখান থেকে যে গতিদাতা আকাশকে পরিচালিত করেন এবং তাদের চলার আদেশ প্রদান করেন, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে তাঁরা এমন এক সত্তার নিকট উপনীত হন, যিনি মানুষের আচরণ থেকে পবিত্র। এ দলও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত।

এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের মতে এই পৃথিবীর সব বিষয়বস্তু জ্বলে যায়, ধুয়ে যায়, মুছে যায়, তবুও তাঁর পবিত্র সৌন্দর্যের ধ্যান করতে থাকেন এবং নিজেদের সত্তা ও সৌন্দর্য দেখতে পান; তাঁদের আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালার সান্নিধ্য লাভের ফলে এ পরম সৌন্দর্য লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে যত কিছু দৃষ্ট হয়, সব দূর হয়ে যায়, মিটে যায়।

আরেক শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদেরও অতিক্রম করেছেন। তাঁদের উঁচু সত্তার উজ্জ্বল্য তাঁদেরকে জ্বালিয়ে দেয়

এবং তাঁরা আল্লাহর গৌরবে আবৃত হন। তাঁরা আত্মচিন্তাও করতে পারে না। কারণ তাঁরা আত্মা হতে বেপরওয়া হয়ে যান। তাঁদের অন্তরে এক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভিন্ন আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এর সমর্থনে আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালার নিম্নোক্ত আয়াত প্রনিধানযোগ্য–

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ـ

অর্থাৎ, "তিনি ব্যতিত আর সব ধ্বংস হয়ে যাবে।"

এদের সম্পর্কে আমি এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে যৎ কিঞ্চিত আলোচনা করেছি।

আরেক প্রকার ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতির জন্য ধাপে ধাপে আরোহণ করেন না। এ সব পথ চলতে তাঁদের দীর্ঘ সময়ও লাগে না। প্রথম পদক্ষেপেই তাঁরা পরম পবিত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে চিনেন। তাঁর প্রথমেই যে জ্ঞানার্জন করেন, অপরের বেলায় তা সর্বশেষে অর্জিত হয়। আল্লাহর তাজাল্লী হঠাৎ তাঁদের উপর পড়ে। ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি যা বুদ্ধির অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বোধগম্য বস্তুকে আল্লাহর তেজস্ক্রিয়তায় জালিয়ে দেয়। এ অবস্থাকে এরূপও বলা যায় যে, প্রথম পথ ছিলো হজরত ইব্রাহীম খালীলুল্লাহর এবং দ্বিতীয় পথ ছিলো নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালাই তাঁদের মঞ্জিলগুলোর আলো এবং তাঁদের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে ভাল জানেন।

এখানে পর্দায় আচ্ছাদিত ব্যক্তিদের শ্রেণীবিভাগের বর্ণনা দেয়া হলে এটা আশ্চর্য নয় যে, এই মাঞ্জিলগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করলে এবং এ পথ যাত্রীদের পর্দাগুলোর অনুসন্ধান করলে তাঁদের সংখ্যা সত্তর হাজার দাঁড়াবে। আপনারা সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দৃষ্টিপাত করলে উল্লেখিত শ্রেণী বিভক্তির বাইরে কোনো কিছু দেখতে পাবেন না।

আপনাদের প্রশ্নের উত্তরে আমি উপরিউক্ত আলোচনা করার প্রয়াস পেলাম। অথচ প্রশ্ন করার সময় আমাদের মন চিন্তাযুক্ত ছিলো, আমার মনোযোগ অন্য বিষয়ে নিবদ্ধ ছিলো, আপনাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ

অনুরোধ– আমার ভুল-ত্রুটি হলে আমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কেননা, আল্লাহর গুঢ় রহস্যের সাগরে ডুব দেয়া বড় বিপদ সঙ্কুল ব্যাপার– উচ্চতর আলোর পর্দাগুলোর ওপর থেকে উম্মোচন করা সহজ নয় অত্যন্ত দুষ্কর।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَالطَّاهِرِيْنَ -

সমাপ্ত